ক্রুসেড-৭
দুর্গ পতন
আসাদ বিন হাফিজ

ক্রুসেড —৭

দুর্গ পতন

আসাদ বিন হাফিজ

প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

ক্রুসেড - ৭

দুর্গ পতন

[আবদুল ওয়াজেদ সালাফী অনূদিত আলতামাশ-এর
'দাস্তান ঈমান ফারুশোকী'র ছায়া অবলম্বনে রচিত]

প্রকাশক
আসাদ বিন হাফিজ
প্রীতি প্রকাশন
৪৩৫/ক বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোনঃ ৮৩২১৭৫৮ ফ্যাক্সঃ ৮৮০-২-৮৩২১৭৫৮

দ্বিতীয় মুদ্রণ : বইমেলা ২০০২
প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ২০০০
প্রচ্ছদ :
প্রীতি ডিজাইন সেন্টার
মুদ্রণ :
প্রীতি কম্পিউটার সার্ভিস

মূল্যঃ [illegible]৫০.০০

CRUSADE-7
Durga Patan
[A heroic Adventure of the great Salahuddin]
by
Asad bin Hafiz
Published by
Pritee Prokashon
435 ka Bara Moghbazar, Dhaka-1217
Phone : 8321758, Fax: 880-2-8321758
2nd Editition: January 2002

PRICE : [illegible]0.00
ISBN 984-581-192-2

ক্রুসেড

খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মরণপন লড়াই কাহিনী

ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে মুছে ফেলার চক্রান্তে মেতে উঠলো খ্রিস্টানরা। একে একে লোমহর্ষক অসংখ্য সংঘাত ও সংঘর্ষে পরাজিত হয়ে বেছে নিল ষড়যন্ত্রের পথ। মুসলিম দেশগুলোতে ছড়িয়ে দিল গুপ্তচর বাহিনী। ছড়িয়ে দিল মদ ও নেশার দ্রব্য। ঝাঁকে ঝাঁকে পাঠাল প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুন্দরী গোয়েন্দা। বড় বড় সেনা অফিসার এবং আমীর ওমরাদের হারেমগুলোতে ওদের ঢুকিয়ে দিল নানা কৌশলে। ভাসমান পতিতা ছড়িয়ে দিল সর্বত্র। মদ, জুয়া আর বেহায়াপনার স্রোত বইয়ে দিল শহরগুলোতে।

একদিকে সশস্ত্র লড়াই – অন্যদিকে কুটিল সাংস্কৃতিক হামলা এ দু'য়ের মোকাবেলায় রুখে দাঁড়াল মুসলিম বীর শ্রেষ্ঠরা। তারা মোকাবেলা করল এমন সব অবিশ্বাস্য ও শ্বাসরুদ্ধকর ঘটনার, মানুষের কল্পনাকেও যা হার মানায়।

ক্রুসেড

সেই সব শিহরিত, রোমাঞ্চিত ঘটনা। শ্বাসরুদ্ধকর বর্ণনায় ভরপুর ইতিহাস আশ্রিত রহস্য সিরিজ

রহস্য সিরিজ ক্রুসেড

আফগানিস্তান থেকে আবার শুরু হয়েছে আধুনিক ক্রুসেড। কিন্তু এ ক্রুসেডের ইতিহাস অনেক দীর্ঘ। হাজার বছর ধরে চলছে এ ক্রুসেড। গাজী সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ক্রুসেডের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন তা বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল। কেবল সশস্ত্র সংঘাত নয়, কূটনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সে যুদ্ধ ছিল সর্বপ্লাবী।

মুসলিম বিশ্বকে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে হলে আপনাকে জানতে হবে এর স্বরূপ। আর এ স্বরূপ জানতে হলে এ সিরিজের বইগুলো আপনাকে পড়তেই হবে।

✖ গাজী সালাহউদ্দীনের দুঃসাহসিক অভিযান ✖ সালাহউদ্দীন আয়ুবীর কমান্ডো অভিযান ✖ সুবাক দুর্গে আক্রমণ ✖ ভয়ংকর ষড়যন্ত্র ✖ ভয়াল রজনী ✖ আবারো সংঘাত ✖ দুর্গ পতন ✖ ফেরাউনের গুপ্তধন ✖ উপকূলে সংঘর্ষ ✖ সর্প কেল্লার খুনী ✖ চারদিকে চক্রান্ত ✖ গোপন বিদ্রোহী ✖ পাপের ফল

অপারেশন সিরিজ

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ। চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন, হত্যা-গুম-খুন-ষড়যন্ত্র। মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে। কিন্তু চীনের অবস্থা? ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই? চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না? চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না। আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী। **তাওহীদুল ইসলাম বাবু** চীনের মুক্তিপাগল মানুষের মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন এক নতুন রহস্য সিরিজ– **'অপারেশন'**।

বেরিয়েছে অপারেশন সিরিজের চারটি বই

✖ আতংকিত নানকিং ✖ সাংহাই সিটিতে রক্তস্রোত ✖ ব্ল্যাক আর্মির কবলে ✖ হাইনান দ্বীপে অভিযান

যে রাতে আলী বিন সুফিয়ান সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীকে বলছিলেন, যুদ্ধ থেকে আগত সেনাবাহিনী মিশরে অবস্থানরত সৈন্যদের ওপর রেগে আগুন হয়ে আছে, সেই রাতে এক রহস্যময় পীর কায়রো থেকে বহু দূরে একটি খেজুর বাগানে তাবু টানিয়ে বসেছিলেন। তার একটা নিয়ম ছিল, তিনি দিনের বেলা এবং চাঁদনী রাতে কারো সাথে দেখা করতেন না। অন্ধকার রাত তার কথা বলার ও সাক্ষাতের সময়। তার মাহফিল অসংখ্য মোমবাতির আলোয় এমনভাবে সাজানো হতো, যেখানে আলো-আঁধারীর রহস্যময় এক জগত তৈরী হয়ে যেতো। সেই আলোর প্রভাব উপস্থিত দর্শকদের মধ্যে যাদুর মত কাজ করতো।

তিনি যেখানে তাবু টানিয়ে দলবল নিয়ে বসেছিলেন, তার অদূরেই গ্রামের ভক্তকুল বসেছিল তাজিমের সাথে। তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মিশরীয় মুসলমান, কিছু ছিল সুদানী হাবশী। সেই গ্রামে একটি মসজিদ ছিল। মসজিদের ইমাম ছিলেন একজন শান্তশিষ্ট নিরীহ আলেম। এক যুবক দু'মাস যাবত তাঁর কাছে ধর্মীয় শিক্ষা লাভ করতে আসতো। যুবকের নাম মাহমুদ। সে দূরের একটি গ্রাম থেকে আসতো। পড়ার প্রতি তার প্রবল আকর্ষণ।

তবে তার চেয়েও বেশি আকর্ষণ ছিল সেই গ্রামের একটি মেয়ের প্রতি। মেয়েটির নাম সাদিয়া।

সাদিয়াও ভালবাসতো মাহমুদকে। প্রায় প্রতিদিনই মাহমুদের আসার পথে এক উপত্যকার ঢালে মেয়েটি বকরী চড়াতো এবং মাহমুদ এলে তাকে তার বকরীর দুধ পান করতে দিতো।

গ্রাম থেকে দূরে সেই নির্জন চারণভূমিতেই তাদের প্রথম সাক্ষাৎ হয়। সাদিয়া সেখানে তার চারটি বকরী ও দুটি উটকে তখন পানি পান করাচ্ছিল। মাহমুদ পিপাসায় কাতর হয়ে পানি পান করার জন্য এগিয়ে গেল মেয়েটির কাছে। সাদিয়া তার হাতে পানি তুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কোত্থেকে এসেছেন?'

'আমি!' বলল মাহমুদ, 'অই ওদিক থেকে।'

'যাবেন কোথায়?'

মাহমুদ উল্টো দিকে ইশারা করে বলল, 'ওদিকে।'

সাদিয়া মাহমুদের কথা শুনে হেসে উঠল, 'বারে! জায়গার কোন নাম নেই?'

'নাম দিয়ে কি করবে তুমি? এ দুনিয়ার সবটাই আল্লাহর, আর আমি তার খলিফা। মানে, এ দুনিয়াটাই আমার। ফলে আমার যেখানে খুশি সেখানে যাবো, তাতে তোমার কি?'

মাহমুদের এমন আজব উত্তরে খিলখিল করে হেসে উঠল সাদিয়া।

'হাসলে কেন?'

'তৌবা, তৌবা!' সাদিয়া তার দু'গালে মৃদু চাপড় দিয়ে বললো, 'তাইতো! কত বড় আস্পর্ধা আমার! ছোটখাট কোন দেশের বাদশার সামনে হাসাই যেখানে বেয়াদবী, সেখানে

দুনিয়ার সম্রাটের পাশে দাঁড়িয়ে হাসাহাসি! না, না, এ মহা অন্যায়। হুজুর আমাকে মাফ করে দিন।' ক্ষমা চাওয়ার ভঙ্গিতে হাত জোড় করল সাদিয়া।

এবার হেসে উঠল মাহমুদও, 'বাহ! আমাকে একেবারে সম্রাট বানিয়ে দিলে!'

এভাবেই ওদের প্রথম আলাপ পরিচয় হয়। মাহমুদ মুসলমান শুনে সাদিয়া তার সাথে অন্তরঙ্গ ব্যবহার করে। খুশি হয়। তার চোখে মুখে সে খুশির ঝিলিক দেখতে পায় মাহমুদ। ঠোঁটে দেখতে পায় লাজরাঙা মধুর হাসি। দু'জনেরই দু'জনকে ভাল লেগে যায়। আলাপ জমে ওঠে।

মাহমুদের কথা শুনতে খুব ভাল লাগছে সাদিয়ার। ও মাহমুদকে জিজ্ঞেস করল, 'সুদানের যুদ্ধের খবর কি?'

তার বলার ভঙ্গিতে মুসলিম সৈন্যদের সম্পর্কে আগ্রহ ও সমর্থন প্রকাশ পাচ্ছিল।

সে যখন সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সম্পর্কে প্রশ্ন করলো, তখন মাহমুদ তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো। সাদিয়া জানতে চাইলো, 'যিনি আকাশ থেকে নেমে এসেছেন এবং মৃতকে জীবিত করতে পারেন সেই পীরের চেয়েও তিনি কি বেশি কামেল ও মহাপুরুষ?'

'সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কোন মৃতকে জীবিত করতে পারেন না।' উত্তরে বলল মাহমুদ, 'তিনি পৃথিবী থেকে অন্ধকার ও অশান্তি দূর করে মানুষকে শান্তি ও আলোতে নিয়ে আসেন।'

সাদিয়া বললো, 'তবে যে শুনেছি, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী একজন খুনি। তিনি নাকি হৃদয়হীন, নিষ্ঠুর। সুযোগ পেলেই

তিনি মানুষ হত্যা করেন?'

'তোমাকে কে বললো তিনি লোকজনকে হত্যা করেন?'

'আমাদের গ্রাম দিয়ে যে সব পথিক যাওয়া আসা করে তাদের মুখে শুনেছি। তারা বলে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী খুব খারাপ লোক। তার দীলে কোন রহম নেই। এমনিতে সে নাকি খুব ভালো ভালো কথা বলে। আমাদের মত নামাজ রোজাও করে। কিন্তু হিংস্রতাই নাকি তার সব ভাল কাজ বরবাদ করে দিয়েছে।'

'তোমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব কি বলেন?' মাহমুদ প্রশ্ন করলো।

'তিনি অবশ্য অন্য রকম বলেন।' সাদিয়া বললো, 'তিনি বলেন, সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ইসলামের আলো সমস্ত মিশর ও সুদানে বিকশিত করতে এসেছেন। আর ইসলামই আল্লাহর একমাত্র সত্য দ্বীন।'

সাদিয়ার কাছ থেকেই সে জানতে পারলো, তাদের গ্রামে ইদানিং এমন সব লোক আসা যাওয়া করে, যারা নিজেদেরকে মুসলমান বলে পরিচয় দিলেও তাদের আচার আচরণে ইসলামের নমুনা পাওয়া যায় না। তারা এমন সব কথা বলে, যাতে মানুষের মনে ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে যায়। তারা বলে, 'সমাজ ও সভ্যতা কখনো এক জায়গায় বসে থাকে না। সভ্যতা এগিয়ে যাচ্ছে, মানুষের জীবন যাত্রায় আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে। পৃথিবীতে টিকে থাকতে হলে আমাদেরও সময়ের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। শুধু ইসলাম নিয়ে বসে থাকলে হবে না।'

আমার এক চাচা জিজ্ঞেস করেছিল, 'কেন হবে না?'

তারা বললো, 'কেমন করে হবে? আপনি কি কোরআনের কোন শব্দ পাল্টাতে পারবেন? যদি না পারেন তবে পুরোনো কোরআনকে জীবন বিধান মেনে নিয়ে আপনি কি করে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলবেন?'

চাচা বললো, 'তাই বলে আমরা কোরআনকে ছেড়ে দেবো, ইসলামকে ছেড়ে দেবো?'

'না, না, তা ছাড়বেন কেন? আমরা কি তাই বলেছি। আমরা কি মুসলমান নই? আমরা কোরআন পড়বো, নামাজ রোজাও করবো। কিন্তু ব্যবসা বাণিজ্যসহ দুনিয়াবী কাজে ইসলামকে টেনে এনে অপবিত্র করবো না। রাজনীতিতে ইসলামকে জড়াবো না। তাহলে ইহকালও রক্ষা পাবে, পরকালও রক্ষা পাবে। রাসূল যখন দুনিয়ায় এসেছিলেন তখন তিনি সে সময়ের আলোকে জীবন ধারণ করেছেন, আমরাও আমাদের সময়ের দাবীকে উপেক্ষা করতে পারি না, এ কথাই আমরা বলতে চাচ্ছি।'

'সময়ের দাবী কি?' চাচা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

'সময়ের দাবী হচ্ছে, এখন মানুষ অনেক সভ্য হয়েছে। পাঁচশো বছর আগে মানুষ যেমন বর্বর ছিল এখন আর তেমন নেই। এমন অনেক সমস্যা আছে যা আমরা আলাপ আলোচনা করে সমাধান করতে পারি। এ জন্য অহেতুক যুদ্ধের কোন দরকার পড়ে না। দুশমন বন্ধুত্বের হাত বাড়ালে তা ফিরিয়ে দেয়া অনুচিত। দিলে তাতে নিজেরই ক্ষতি হয়। মারামারিতে কখনো এক পক্ষ মরে না, দু'পক্ষই মারা পড়ে তাতে। তাই 'কারো সাথে শত্রুতা নয়, সবার সাথে বন্ধুত্ব' এ নীতি গ্রহণ করে অশান্তির পরিবেশ থেকে ফিরে আসাই এখন

সময়ের দাবী।'

মাহমুদ সাদিয়ার সাথে আলাপ করে অনেক কিছুই জানতে পারলো। বুঝলো, ইসলামের পক্ষে যারা কাজ করছে তাদের চরিত্র হননের কাজে নেমেছে দুশমন। আর কেউ না জানুক, মাহমুদ তো জানে সুলতান আয়ুবীর মনে মানুষের জন্য কী অপরিসীম দরদ! নিজের জীবন বিপন্ন করে আইয়ুবী এত যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ছেন তা কেবল মানুষ ও মানবতার কল্যাণের জন্য। ধন-দৌলত বা অন্য কিছুর জন্য তাঁর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার কোন দরকার নেই।

সাদিয়াকে সে বলল, 'সাদিয়া, তুমি যা শুনেছো সবই ভুল। ইসলামের দুশমনদের মিথ্যা প্রচারণা। যারা এসব কথা বলেছে তারা মুসলমান কি অমুসলমান আমার জানা নেই। হয়তো জন্মসূত্রে তারা মুসলমান। কিন্তু মুসলমানের ঘরে জন্ম নিলেই কেউ মুসলমান হয়ে যায় না। তুমি জানো, মুসা নবীর সন্তান কেনান ইসলাম গ্রহণ করেনি। ফলে নবীর সন্তান হয়েও সে মুসলমান হতে পারেনি। অন্য দিকে হাজার হাজার কাফের ইসলামের নীতি ও আদর্শকে গ্রহণ করে মুসলমান হয়েছে।

আজকে যারা ইসলামের শত্রুদের চক্রান্তে পড়ে কোরআন ও সুন্নাহর বিরুদ্ধে কথা বলছে, যতই তারা নামাজ রোজা করুক, নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করুক, তারা যে ইসলামের স্বপক্ষ শক্তি নয় এতে কোন সন্দেহ নেই! ইসলামের বিপক্ষ শিবিরে অবস্থান করে এবং ইসলামের বিরুদ্ধে কাজ করে কেউ মুসলমান থাকতে পারে কিনা আমার জানা নেই। মোনাফিকদের অবস্থান নাকি কাফেরের চাইতেও

নিচে। কাল হাশরের মাঠে এদেরকে মুসলমানের দলে রাখা হবে, না মোনাফিকের দলে, সে চিন্তা আমার নয়, যারা এ কাজ করছে তারাই করুক। আমি শুধু বলবো, এরা এখন যা করছে তা ইসলামের জন্য ক্ষতিকারক।'

'কিন্তু খুন খারাবি তো আসলেই খারাপ। তুমি কি মারামারি সমর্থন করো?'

'সাদিয়া, তুমি তো জানো, পৃথিবীতে আমাদের মহানবীর চেয়ে দয়ালু কোন মানুষ আজ পর্যন্ত আসেননি এবং ভবিষ্যতেও আসবেন না। কেবল মিত্র নয়, নিজের আত্মীয়-স্বজন নয়, সঙ্গী সাহাবী নয়, পৃথিবীর সব মানুষকে ভালবাসতেন তিনি। এমনকি শত্রুকেও। তাইতো তাঁকে রাহমাতুল্লিল আলামীন বলা হয়। তাঁর মানবপ্রেমের কত শত কাহিনী ছড়িয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। যে বুড়ি প্রতিদিন তাঁর চলার পথে কাঁটা দিত, অসুখের সময় তাকেও সেবা দিয়ে বাঁচিয়েছিলেন রাসূল। তুমি কি খুনি বলে ঘৃণা করবে এই মহামানবকে?'

মাহমুদের কথায় অবাক হয় সাদিয়া, 'কেন? তাঁকে ঘৃণা করবো কেন? তিনি তো দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম মানুষ। শুধু মুসলমানরাই নয়, অনেক অমুসলমানও তাঁকে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে।'

মাহমুদ বলে, 'সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যেমন মানুষ হত্যা করে, যুদ্ধ করে, তিনিও জীবনে তেমনি অসংখ্য যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধ করলেই কেউ খুনি হয় না, বরং যুদ্ধ করে মানবতার শত্রুদের বিনাশ না করলে অন্যায় হয়। আইয়ুবীও তেমনি মানবতার শত্রুদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরেছেন। ইসলামের

দুশমনরা তাই তাঁকে দেখতে পারে না, তাঁকে খুনি, সন্ত্রাসী বলে সমাজে তাঁকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়।'

মাহমুদের কথায় সাদিয়ার মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়।

মাহমুদ বলে, 'চলি সাদিয়া। আল্লাহ চাইলে আবার আমাদের দেখা হবে।'

মাহমুদের মিষ্টি ব্যবহার ও তার ব্যক্তিত্ব সাদিয়ার কোমল মনে গভীর রেখাপাত করে। মাহমুদের ভাষার মাধুর্য ও চিন্তার স্বচ্ছতায় বিস্ময়বোধ করে সে। আবারো তার সাথে কথা বলার জন্য অধীর হয়ে উঠে তার মন। বলে, 'আমি প্রতিদিন বেশির ভাগ সময় এখানেই বকরী ও উট চরাতে আসি। যদি এ পথে কখনো আসেন দেখা করে গেলে খুশি হবো।'

'অবশ্যই তোমার সাথে দেখা করবো আমি।' বলল মাহমুদ।

মাহমুদ সাদিয়ার হৃদয়ে এক অশান্ত ঢেউ তুলে চলে গেল সেখান থেকে। একাকী, পেরেশান অবস্থায় সাদিয়া তার চলে যাওয়া পথের দিকে তাকিয়ে মনে মনে বলল, 'কে তুমি যুবক? কোত্থেকে এলে তুমি আমার মনোবীণায় সুর বাজাতে! আমার হৃদয় সাগরে অশান্ত ঢেউ জাগাতে? তোমার পোষাক-পরিচ্ছদ এ অঞ্চলের মত হলেও তোমার চেহারা, তোমার আকৃতি, তোমার কথা বলার ভঙ্গি বলে, তুমি এ অঞ্চলের কেউ নও।'

সাদিয়ার সন্দেহ সত্য ছিল। মাহমুদ বিন আহমদ কোন

পল্লী এলাকার মানুষ ছিল না। সে ছিল আলেকজান্দ্রিয়া শহরের বাসিন্দা। আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দা বিভাগের একজন চৌকস কর্মী। কয়েক মাস ধরে তার দায়িত্ব পড়েছে সীমান্ত এলাকায়। সেই থেকে সে এই পল্লী অঞ্চলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

নিজের পরিচয় সে যথেষ্ট গোপন রেখেছিল। তার সাথে আরও কয়েকজন গোয়েন্দা এ অঞ্চলে কাজ করছে। তারাও বিভিন্ন বাহানায় ঘুরে বেড়াচ্ছে গ্রামে গ্রামে। মাঝেমধ্যে তারা একত্রে মিলিত হয়। তারা যে সব খবর সংগ্রহ করতে পারে তা নিয়মিত এক সাথীকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয় কায়রো। এভাবেই আলী বিন সুফিয়ানের গোয়েন্দারা সীমান্ত এলাকায় এক অদৃশ্য গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে।

সাদিয়াদের পাশের গ্রামের দু'টি মসজিদের ইমামের ব্যাপারে সে এরই মধ্যে সন্দেহজনক খবর পেয়েছে। জানা গেছে, ওই দুই মসজিদে নতুন ইমাম এসেছে। আগে এই দুই মসজিদে কোন বাঁধাধরা ইমাম ছিল না। গ্রামের মরুব্বীদের যিনি যখন উপস্থিত থাকতেন তিনিই নামাজ পড়াতেন।

নতুন ইমাম এসে জিহাদের বিরুদ্ধে ওয়াজ শুরু করল। কুরআনের আয়াত পাঠ করে তার ভুল তাফসীর ও ব্যাখ্যা দিতে লাগল। রহস্যময় পীরকে তারা সত্য বলে প্রচার করল এবং পীরের সাথে দেখা করে ফয়েজ ও বরকত লাভের উপদেশ দিতে লাগল জনগণকে। মাহমুদ এই ইমাম দু'জনের ব্যাপারে ইতিমধ্যেই কায়রো রিপোর্ট পাঠিয়েছে।

সাদিয়ার কাছ থেকে মাহমুদ জানতে পারল, তাদের গ্রামের ইমাম সুলতান আইয়ুবীর ভক্ত এবং ইসলামের

নিশানবাহী। এ খবর শুনে সে খুব খুশি হলো। মনে মনে ভাবল, সাদিয়ার তথ্য কতটা সঠিক একটু খতিয়ে দেখা দরকার।

সে সাদিয়াদের গ্রামের মসজিদে গিয়ে ইমামের সাথে সাক্ষাৎ করলো। ইমাম সাহেবকে মাহমুদ বললো, 'আমি ধর্মীয় জ্ঞান লাভের জন্য উস্তাদ খুঁজে বেড়াচ্ছি। আপনি কি কষ্ট করে আমাকে একটু দ্বীনি তালিম দেবেন?'

ইমাম সাহেব মাহমুদের প্রস্তাবে সানন্দে রাজী হয়ে বললেন, 'যুবক, তোমার প্রস্তাব আমি সানন্দে কবুল করলাম। দ্বীনী তালিম নেয়ার প্রতি তোমার আগ্রহ দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছি। ইচ্ছে করলে তুমি কাল থেকেই তালিম নিতে আসতে পারো।'

পরের দিন থেকেই মাহমুদ নিয়মিত ইমামের কাছে তালিম নিতে শুরু করল।

ইমাম সাহেব মসজিদে একাই থাকতেন। ইসলামের সঠিক শিক্ষা জনগণের মধ্যে প্রচার করায় পীরপন্থী লোকেরা তার ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। মুসল্লীদেরকে উত্তেজিত করতে লাগল তারা। তিনি অনুভব করলেন, মুসল্লীদের উত্তেজিত করার এ কাজে খৃস্টানদের অনুচররাও সক্রিয়। ক্রমেই অবস্থার অবনতি ঘটতে লাগল। এক সময় জীবনের নিরাপত্তা নিয়েই শংকিত হয়ে পড়লেন তিনি। ভাবলেন, এখন তার একজন সঙ্গী দরকার।

একদিন তিনি মাহমুদকে বললেন, 'মাহমুদ, তুমি ইচ্ছে করলে এখানেই থাকতে পারো। তাতে তোমার পড়াশোনার

সুবিধা হবে।'

মাহমুদের পক্ষে সারাক্ষণ মসজিদে আটকে থাকা সম্ভব ছিল না। সে ইমাম সাহেবকে বললো, 'দু'তিন দিন পর পর বাড়ী যাওয়ার সুযোগ পেলে এখানে থাকতে আমার আপত্তি নেই।'

ইমাম সাহেব একটু হাসলেন এবং জানতে চাইলেন, 'তোমার বাড়ি কোথায়?'

মাহমুদ ইমাম সাহেবের কাছে তার আসল ঠিকানা বলল না। সে বেশ দুরের সীমান্তবর্তী একটি গ্রামের নাম বলে দিল।

ইমাম সাহেব এবার জোরে হেসে ফেললেন এবং আস্তে করে বললেন, 'মাহমুদ বিন আহমদ! আমি তোমার বুদ্ধিমত্তা ও তৎপরতায় খুবই খুশি। দায়িত্ব পালনের সময় আমাদের প্রত্যেকেরই এমন সজাগ ও সতর্ক থাকা প্রয়োজন। আমি আগেই শুনেছিলাম, আলেকজান্দ্রিয়ার মুসলমানরা দায়িত্বের ব্যাপারে খুবই নিষ্ঠাবান ও নির্ভরশীল হয়। তোমাকে দেখে এর সত্যতার প্রমাণ পেলাম।'

মাহমুদ এমন চমকে উঠলো যে, ভয় পেয়ে সে দাঁড়িয়ে গেল। সে মনে করল, ইমাম সাহেব ক্রুসেডের চর এবং তার কাছে তার পরিচয় ফাঁস হয়ে গেছে। সে মুহূর্তে আকস্মিক হামলা মোকাবেলা করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে গেল। ইমাম সাহেব কথা শেষ করলেও সে একই অবস্থায় দাঁড়িয়ে রইল এবং পেরেশান হয়ে ইমাম সাহেবের চোখের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলো, কোন দিক থেকে প্রথম আঘাতটা আসবে।

ইমাম সাহেব তাকে বেশীক্ষণ এই সন্দেহের রাজ্যে থাকতে দিলেন না। তিনি বললেন, 'আমি অনুভব করছি, কমপক্ষে তোমার কাছে আমার গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন নেই। আমিও তোমার মত আইয়ুবীর গোয়েন্দা বিভাগের একজন সামান্য খাদেম। তোমার যে সব সঙ্গী সাথী এ অঞ্চলে কাজ করছে তাদের প্রায় সকলকেই আমি চিনি। অবশ্য আমি জানি, আমাকে তোমরা কেউই চেনো না। কারণ, শত্রুদের ওপর দৃষ্টি রাখার সাথে সাথে আমাদের গোয়েন্দাদের তৎপরতার ওপরও দৃষ্টি রাখা আমার দায়িত্ব। আমি আমার দায়িত্ব পালনের জন্যই ইমাম হিসাবে এখানে আছি।'

'কিছু মনে করবেন না, আপনি যে পর্যায়ের দায়িত্ব পালন করছেন তাতে আপনার আরো হুশিয়ার হওয়া উচিত।' মাহমুদ আশ্বস্ত হয়ে বললো, 'আমার কাজে আপনি খুশি হয়েছেন, কিন্তু আমার সামনে আপনি নিজেকে যেভাবে উন্মুক্ত করে দিলেন তাতে আমি খুশি হতে পারিনি। একটু অসতর্কতাই শত্রুর কাছে আপনার পরিচয় ফাঁস করে দিতে পারে।'

'আমি অসতর্ক নই মাহমুদ, আমি তোমার পরিচয় জানি।' ইমাম সাহেব বললেন, 'এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তোমার কাছে আমার আসল রূপ প্রকাশ করার। আমার আরও দু'জন সঙ্গী ছদ্মবেশে এখানে জনসাধারণের সাথে মিশে আছে। আমার আরও লোকের প্রয়োজন। তুমি আমার কাছে চলে আসায় ভালই হয়েছে।

এই গ্রামে শত্রুদের আনাগোনা বেড়ে গেছে। তুমি

হয়তো সে পীর সম্পর্কে শুনেছো, যে অজ্ঞাত ভবিষ্যতের খবর বলতে পারে আর মৃতদের জীবিত করতে পারে বলে গুজব ছড়াচ্ছে। এই গ্রামও সেই গুজবে মেতে উঠেছে। আমি গ্রামবাসীদের বলেছি, 'এসব মিথ্যা প্রচারণা, মৃত লাশের মধ্যে কেউ প্রাণ দিতে পারে না।'

কিন্তু গুজব যাদুর মত ছড়িয়ে পড়ায় লোকেরা আমার কথায় কান দিচ্ছে না, আমার বিরুদ্ধে এখানে আন্দোলন দানা বেঁধে উঠছে। আমি এখন আরো সতর্ক হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করছি। ইদানিং তাই আর মসজিদ থেকে বেশি বের হই না। এ ব্যাপারেই তোমাকে আমার পাশে দরকার।

আমার এখন সঙ্গী প্রয়োজন। এখানকার যে সব লোককে ধোঁকায় ফেলে বিপথগামী করা হচ্ছে তাদেরকে ইসলামের সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার জন্যই এ সঙ্গী দরকার আমার। তোমাকে একটা ঘটনার কথা বলি, পনেরো বিশ দিন আগে রাতে আমার কাছে দু'জন লোক আসে। আমি তখন হুজরাখানায় একা ছিলাম। লোক দু'জনের মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা ছিল। তারা আমাকে হুমকি দিয়ে বললো, 'এখান থেকে চলে যাও।'

আমি বললাম, 'কোথায় যাবো! আমার যে কোন ঠিকানা নেই।'

তারা বললো, 'যদি এখানে থাকতে চাও তবে তালিম দেয়া বন্ধ করো আর সেই পীরের কথা বলো, যিনি আকাশ থেকে খোদার সঠিক দ্বীন নিয়ে এসেছেন।'

আমি মুখোশপরা ওই আগন্তুক দু'জনের সাথে মোকাবেলা করতে পারতাম। অস্ত্র আমি সব সময় সাথেই

রাখি। কিন্তু আমি দু'জনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের হত্যা করলে কিংবা নিজে আহত বা নিহত হলে তো আর সমস্যা মিটে যাবে না। আমি তাই খুব ধীরস্থিরভাবে চিন্তাভাবনা করলাম। বিবেচনা করে দেখলাম, তাদের প্রস্তাব মেনে নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। বললাম, 'ঠিক আছে, আজ থেকে তোমাদের কথা মতই চলবো। আমাকে নিজেদেরই একজন মনে করতে পারো এখন থেকে।'

তারা বললো, 'এ ওয়াদা মত চললে তুমি তোমার কাজের যথাযোগ্য পুরস্কার পাবে। তোমাকে আর হত্যা করার দরকার হবে না। তার বদলে তুমি পাবে ধন-দৌলত, অঢেল স্বর্ণমুদ্রা।'

'তারপরে কি আপনি আপনার ওয়াজের স্টাইল পাল্টে ফেলেছেন?' মাহমুদ প্রশ্ন করে।

'যতটুকু পারা যায়।' ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি এমনভাবে কথা বলি যাতে দু'কুলই রক্ষা পায়। স্বর্ণমুদ্রা লাভের আশায় নয়, সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের স্বার্থেই এ কৌশল গ্রহণ করতে হয়েছে আমাকে।'

তিনি আরো বললেন, 'তোমাদেরকে কি করে খবর দেবো এ নিয়ে আমি পেরেশান ছিলাম। তোমাকে ও তোমার সাথীদের খুঁজে বেড়াতে বাইরে গেলে তাতে সবারই জীবনের ঝুঁকি বেড়ে যেতো। এ জন্য আল্লাহ নিজেই তোমাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন। যেদিন থেকে আমার কাছে তুমি তালিম নেয়া শুরু করেছো সেদিন থেকেই আমার মস্তবড় একটা দুর্ভাবনা দূর হয়ে যায়।'

'আপনি কি রাতে একাই থাকেন?'

'হ্যাঁ, পরিস্থিতি এখন বেশ জটিল হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় আমার একা থাকা ঠিক হচ্ছে না। তার চেয়ে তুমি আমার কাছে থাকো। তুমি আমার ছাত্র হিসেবে কাছে থাকলে কেউ কিছু মনে করবে না।'

'জ্বি, আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'গ্রামে দুশমনের তৎপরতা খুবই বেড়ে গেছে। এদের মোকাবেলা করার জন্য আমার এখন শক্তির প্রয়োজন। গ্রামে আমার কিছু ভক্ত আছে, ওরা আমার সাথে সহযোগিতা করবে। এদিকে তোমরা থাকায় সে শক্তি আরো বৃদ্ধি পেলো। কিন্তু অবস্থা যা তাতে বড় ধরনের বাহিনী দরকার হতে পারে। তাহলেই আমি বিপদে পড়ে যাবো। সীমান্তের কোন রক্ষী কমাণ্ডারের ওপর বিশ্বাস বা ভরসা করা এখন ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। শত্রুরা স্বর্ণমুদ্রা ও সুন্দরী নারী দিয়ে তাদের হাত করে রেখেছে। তারা মাসিক বেতন নেয় আমাদের সরকার থেকে আর কাজ করে শত্রুদের।'

সেদিন থেকে মাহমুদ বিন আহমদ তাঁর কাছেই থেকে গেল। ইমাম সাহেব তাঁর কয়েকজন ভক্তের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন মাহমুদের।

কিছু দিন ধরে মিশরের পল্লী অঞ্চলে শুরু হয়েছে এক নতুন ফেতনা। গ্রামের অশিক্ষিত মূর্খ লোকদের কুসংস্কারকে পুঁজি করে সেখানে এক পীরের আবির্ভাব হয়েছে। নানা রকম কেরামতি দেখিয়ে সে কোমলমতি সরল লোকগুলোর ঈমান ক্রয়ের চেষ্টা করছে। ব্যবসাটা যথেষ্ট লাভজনক। কেবল ভক্তি আর শ্রদ্ধাই নয়, দেদার মালকড়িও আসছে এতে।

এই পীর কোথাও আস্তানা গাড়ে না। আজ এখানে, কাল ওখানে ঘুরে বেড়ায়। গ্রামের লোকেরা তার পথের দিকে চেয়ে থাকে উন্মুখ হয়ে। একজন আরেকজনকে বলে, 'বড় কামেল পীর, আহা! কী দ্বীনদান, কত পরহেজগার! তিনি মানুষের মনের কথা পর্যন্ত বলে দিতে পারেন।'

'আহা! শুধু তাই নাকি, উনি তো মানুষের ভবিষ্যতও দেখতে পারেন!'

'শুনেছি উনার কাছে গিয়ে কিছু বলতে হয় না? মানুষের চেহারা দেখেই নাকি সব কিছু বুঝে ফেলেন উনি। বলে দেন তার বিপদের কথা? অসুখ নিয়ে গেলে কিছু জিজ্ঞেস না করেই অসুধ দিয়ে দেন?' আরেকজন জানতে চায়।

'তো আর বলছি কি! তিনি মানুষের ভুত-ভবিষ্যত সব দেখেন, সব বলতে পারেন।'

'আমি তো শুনেছি তিনি মৃতকেও জীবিত করে দিতে পারেন।'

কেউ দেখে, কেউ না দেখেই এ পীরের ভক্ত হয়ে যায়। গ্রামের সরল মানুষগুলো তার কেরামতির কথা এমন অন্ধভাবে বিশ্বাস করে, এতটা ভয় ও ভক্তি তারা আল্লাহর কালামকেও করে না। তার কথার সত্যাসত্য যাচাই করার প্রয়োজনও মনে করে না কেউ। লোকজনের বিশ্বাস, এ পীর আকাশ থেকে নেমে এসেছে। খোদার সাথে তার সরাসরি যোগাযোগ। তার কাছে যা চাওয়া যাবে তাই পাওয়া যাবে।

পথিকরা পথ চলতে চলতে গল্প করতো এ পীরের কেরামতি নিয়ে। কেউ একজন বানিয়ে বলতো তার গ্রামে পীর সাহেব কি কি কেরামতি দেখিয়েছে। অন্যজনই বা

পেছনে পড়ে থাকবে কেন, সে আরো অবাক করা কাহিনী শোনাতো তাকে। এভাবে এ পীরের কেরামতির অদ্ভুতসব কাহিনী মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল সীমান্ত এলাকার সর্বত্র।

কিছু লোক তাকে নবীর মত মানতে শুরু করল। কেউ বললো, ইনি বৃষ্টি দিতে পারেন। এভাবে আজগুবী গল্পে ভরে গেল দেশ-গ্রাম।

তারা পীর সাহেবকে এমন ভক্তি শ্রদ্ধা করতো যে, পীর সাহেবকে খুশি করার জন্য তারা সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারতো। এমনকি নিজের জীবনটা দিয়ে দিতেও প্রস্তুত ছিল কেউ কেউ।

এ যাবত কেউ পীরের বিশ্বাস ও আকিদা নিয়ে প্রশ্ন তোলার সাহস করেনি। কারণ গ্রামের এ সব অশিক্ষিত মানুষরা তখনও আদিম যুগের মতই অন্ধ বিশ্বাসে বাস করত। তারা বিদ্যাবুদ্ধি থেকে বঞ্চিত ছিল বলে, যে তাদেরকে একটু আশার বাণী শোনাতে পারতো তার সামনেই সিজদায় পড়ে যেত।

এই জনগণের অধিকাংশই ছিল মুসলমান। তাদের পূর্ব পুরুষরা ইসলামের আলোয় উদ্ভাসিত ছিল। কিন্তু শিক্ষার অভাবে সে আলোর আভা দিনে দিনে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। বাপ মুসলমান ছিল বলে তারা নিজেদেরও মুসলমান মনে করতো, কিন্তু ইসলামের সঠিক ধারনা না থাকায় যে যা বুঝায় তাকেই তারা ইসলাম বলে মনে করতে থাকে।

এসব গ্রামে মসজিদ ছিল। আল্লাহর ঘর কাবার দিকে ফিরে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজও আদায় করতো অনেকে। কিন্তু ইসলামের সঠিক আকিদা ও বিশ্বাসকে জানার ও বুঝার জন্য

কোন চেষ্টা ওদের ছিল না।

যেমন সমাজ তেমনি ছিল তাদের ইমাম। ইমাম সাহেব তার ইমামতি ঠিক রাখার জন্য এবং লোকদের ভক্তি শ্রদ্ধা আদায় করার জন্য নানা রকম আজগুবী ও অমূলক কথা শোনাতো মুসল্লিদের। ইমাম তাদের বললো, 'কুরআন এক মহাপবিত্র কিতাব, সাধারণ মানুষের উচিত নয় তা স্পর্শ করা। কুরআন পড়বেন ইমাম সাহেবরা। ইমামরা যা বলবেন, সাধারণ মানুষের উচিত সেই মত কাজ করা। তাহলেই আল্লাহর নেক নজর পাবে তারা, পরকালে রাসূলের শাফায়াত পাবে। এটাই ইসলামের পথ, এ পথেই রয়েছে তাদের ইহ ও পরকালের মুক্তি ও কল্যাণ।'

এই ইমাম সাহেবরা মানুষকে শোনাতো অদৃশ্য জগতের কথা। পরকালের নানা শাস্তি ও বিপদের কথা। তারা মানুষকে বলতো, 'সবকিছুরই একটা গোপন দিক আছে, আর ইসলামের যে গোপন তত্ত্ব তা কেবল ইমাম সাহেবই জানেন। মৃত্যুর পর তোমরা এক অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে। এ দুনিয়ার সুখ আসল সুখ নয়, পরকালের জীবনই মানুষের আসল জীবন। সেই জীবনে সফলতা লাভ করতে হলে তোমাদেরকে ইমাম সাহেবের কথা মতো চলতে হবে।'

এসব ইমামরা মানুষের মনে আল্লাহর ভয় না ঢুকিয়ে ইমামের ভয় ঢুকাতো। তারা এসব শিখেছিল সেই মহা ক্ষমতাবান পীর সাহেবের কাছ থেকে। এভাবে এই মূর্খ ইমামরা মানুষের মনে নানা রকম ভয়ভীতি ঢুকিয়ে তাদের দুর্বল করে ফেলে। ফলে মানুষ ইমামদের ভয় করতে শিখল, ধর্মকে ভয় করতে শিখল। ইমামরা তাদের সত্য মিথ্যা যা

বলতো, তারা তা সবই বিশ্বাস করতো।

এসব ভণ্ড ইমাম ও ইমামদের নেতা সেই ভণ্ড পীরের পাল্লায় পড়ে তারা নানা অমূলক কথা বিশ্বাস করতে লাগল। তারা বিশ্বাস করতো, অদৃশ্য শক্তি ক্ষেপে গেলে মরুভূমিতে ঝড়ের তাণ্ডব শুরু হয়। বাতাসের শোঁ শোঁ আওয়াজ অদৃশ্য শক্তির আর্তনাদ ও কান্নার শব্দ। মানুষের রোগ-ব্যাধি হয় জ্বীন-ভূতের নজর থেকে। সাধারণ মানুষ এই অদৃশ্য শক্তিকে দেখতে পায় না। কেবল ইমাম ও পীরই পারেন এইসব ভূত-পেত্নী ও অদৃশ্য শক্তিকে বশ করতে, তাদের খুশি করতে।

এভাবে একদল প্রতারক লোক মানুষের রোগ ব্যাধির চিকিৎসক হয়ে গেল। কোন হুজুর কয়টা ভূত তার কব্জায় রেখেছে তার ওপর নির্ভর করতো তার মর্যাদা।

আল্লাহর চেয়ে এই সব অজ্ঞাত শক্তির ভয়েই মানুষ বেশি ভীত সন্ত্রস্ত থাকতো। যে যতো গায়েবের ভয় দেখাতে পারতো মানুষ তার কথাই বেশি করে বিশ্বাস করতো। ফলে গ্রামের এসব অশিক্ষিত ও অল্প শিক্ষিত মানুষের অন্তরে ইসলামের মূল বিশ্বাস ছিল খুবই দুর্বল।

এই পীর ও পীরভক্ত ইমামরা মানুষকে কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসে এমনভাবে নিমগ্ন করে ফেলল, যার প্রভাব থেকে লোকজনকে মুক্ত করা এবং ইসলামের সত্য সঠিক পথে নিয়ে আসা ছিল খুবই দূরূহ। মানুষ সরাসরি আল্লাহর কাছে কিছু চাইতে পারে এ কথা তাদের জানা ছিল না। তারা বরং সেই পীর ও ইমামের আশায় বসে থাকতো, যে তার বকরীর গায়ে ফুঁ দিলে বকরী দুধ বেশি দেবে, যার ফুঁ দেয়া পানি খেলে তার অসুখ সেরে যাবে, যে ছুঁয়ে দিলে বন্ধ্যা নারীর সন্তান হবে

এবং যাকে গাছের প্রথম খেজুরগুলো দিয়ে দিলে রুজি রোজগার বেড়ে যাবে।

সে যুগে দেশের সীমানা আজকের মত এত নিখুঁতভাবে নির্ধারণ করা থাকতো না। কিন্তু সুলতান আইয়ুবী তার সাম্রাজ্যের সীমানা একটি কাগজের ওপর এঁকে নিয়েছিলেন। তিনি হিসাব করে দেখলেন ধর্মীয় গোমরাহীর এই উৎপাত সীমান্ত অঞ্চলেই বেশি।

রাষ্ট্রীয় সীমানার ব্যাপারে আইয়ুবী অবশ্য অন্য রকম ধারনা পোষণ করতেন। তিনি বলতেন, 'ইসলামী রাষ্ট্রের স্থায়ী সীমারেখা বলে কিছু নেই। যেখানে ইসলামী শাসন আছে সেটা ইসলামী রাষ্ট্র, আর যেখানে মানব রচিত মতবাদ চালু আছে সেটা অনৈসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য, তার অধিবাসী এবং শাসক যদি মুসলমান হয় তবুও।'

মিশরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে সুযোগ পেলেই খৃস্টানরা সরাসরি আক্রমণ চালাতো। একদিন সে আক্রমণ বন্ধ করে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করল। ইসলামী আদর্শের অনুসারীদের ঈমানী চেতনা দুর্বল করার জন্য এক ব্যক্তিকে পীর বানিয়ে পাঠিয়ে দিল সেই সীমান্তবর্তী গ্রামাঞ্চলে। এ আগ্রাসনের উদ্দেশ্য ছিল দুটো, প্রথমত মুসলমানদের আকিদা বিশ্বাস নষ্ট করা, আর দ্বিতীয়ত নিজস্ব মতবাদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা।

খৃস্টানদের প্রধান আক্রোশ ছিল কোরআনের ওপর। কারণ, কুরআন জিহাদকে মুসলমানের ওপর ফরজ করে দিয়েছে। মানুষের ওপর জুলুম, অত্যাচার হলে তা থেকে তাদের বাঁচানোর জন্য মুসলমানরা যে লড়াই করে, কোরআন

তাকেই জিহাদ বলেছে। কোরআন মুসলমানদের ওপর এই জিহাদকে ফরজ, মানে বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে।

যুদ্ধের ময়দানে মুজাহিদদের মধ্যে যে প্রচণ্ড আবেগ ও অনুপ্রেরণা দেখা যায়, তা কুরআনের এ ঘোষণারই ফল। তারা যখন লড়াইয়ের ময়দানে আসে, এ ফরজ দায়িত্বের অনুভূতি নিয়েই আসে। এ অনুভূতি তাদের অন্তরে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে থাকে বলেই তারা হতে পারে এত বেপরোয়া, এত দুঃসাহসী। প্রাণের কোন মায়া নেই তাদের, কারণ কোরআন তাদের বলে দিয়েছে, মোজাহিদ কোনদিন মরে না। যে আল্লাহ তাকে তাঁর প্রতিনিধি হিসাবে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, লড়াই করতে করতে যুদ্ধের মাঠ থেকে জীবনের চূড়ান্ত সাফল্য নিয়ে মুজাহিদদের একদল চলে যায় সেই আল্লাহর কাছে। এদের বলা হয় শহীদ। আরেক দল যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে গাজী হয়ে ফিরে যায় আপন ঠিকানায়। ময়দান থেকে ওরা ফেরে শাহাদাতের গৌরব লাভের অপূর্ণ আকাঙ্খা নিয়ে।

গনিমতের মাল তাদের জন্য হালাল, কিন্তু গনিমতের মালের আশায় তারা কখনও যুদ্ধ করে না। অন্য দিকে খৃস্টানরা যুদ্ধ করে সাম্রাজ্য বিস্তারের লালসায়। যুদ্ধ জয়ের চেয়ে লুটপাটের দিকেই তাদের নজরটা থাকে বেশি।

সেই রহস্যময় পীর সম্পর্কে সীমান্তের গ্রামগুলোতে গুজব ছড়িয়ে পড়ে, আকাশ থেকে এসেছেন তিনি! খোদার দ্বীন নিয়ে এসেছেন তিনি! তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন। মানুষের সেবা করার জন্য সঙ্গী সাথী নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়ান গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে।

যারা তাকে দেখেছে তারা বলে, 'হুজুরের দাড়ি উজ্জ্বল

সাদা, গায়ের রং ফর্সা, মাথার চুল লম্বা ও ঢেউ খেলানো। তার টানা টানা চোখে যেন চাঁদের আলো, দাঁত মুক্তার মত স্বচ্ছ। বীরের মত টান টান সিনা আর বলিষ্ঠ শরীর।

হুজুরের সাথে থাকে উটের লম্বা বহর আর অনেক খাদেম। মানুষ ভক্তি ভরে হুজুরকে যে নজরানা দেয় সে সব বহন করে এ উটের কাফেলা। তিনি শহর-বন্দরে যান না, দুঃখী মানুষের সেবা করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। গ্রামের পাশে তাবু খাটিয়ে কয়েকদিন সেখানে থাকেন। আশপাশের গ্রামের লোকদের দুঃখ দূর করে চলে যান অন্য এলাকায়।

উট ও ঘোড়ার কাফেলা তার আগমনের সুসংবাদ নিয়ে আগে আগে যায়। ঘোড় সওয়াররা সামনের গ্রামগুলোতে পৌঁছে চিৎকার করে বলতে থাকে, 'তিনি আসছেন! পীর সাহেব তশরিফ আনছেন! কোথায় তোমরা, চারদিকে এ খবর পৌঁছে দাও! তোমাদের সব সমস্যা সমাধা করে দেবেন তিনি! যে যেখানে আছো, অমুক প্রান্তরে গিয়ে সমবেত হও!'

লোকজন চারদিক থেকে ঘিরে ধরে তাদের। তারা লোকজনকে শোনায় হুজুরের কেরামতির গল্প, তার রুহানী শক্তির অপূর্ব সব কাহিনী। গ্রামের লোকের মধ্যে সাজ সাজ সাড়া পড়ে যায়। আশপাশের দশ গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে পীর সাহেবের আগমনের আনন্দ বার্তা।

সেনাবাহিনীকে পেছনে রেখে আলীকে নিয়ে রাতের আঁধারে কায়রোর পথ ধরেছিলেন সুলতান আইয়ুবী। যখন তিনি কায়রো শহরে প্রবেশ করেন তখনো শহর তেমন জেগে

উঠেনি। ফজরের নামাজ পড়ে দু'একজন প্রবীণ ব্যক্তি প্রাতঃভ্রমণে বের হয়েছেন। এ ছাড়া রাস্তাঘাটে তেমন কোলাহল নেই।

যেন ঘোড়ায় চড়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন এমন একটি ভাব নিয়ে গল্প করতে করতে সুলতানের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন আলী ও আইয়ুবী। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া থেকে বাঁচার জন্য যেভাবে মানুষ চোখ মুখ ঢেকে রাখে তাদের চেহারাও সেভাবে নেকাবে ঢাকা। দু'একজন পথচারী যারা তাদের দেখেছে, তারা কেউ ভাবেওনি সুলতান আইয়ুবী এভাবে ফিরে আসতে পারেন। ফলে কেউ তাদের চিনতে পারল না। লোকজনের দৃষ্টি এড়িয়ে মহলে প্রবেশ করলেন তারা। শহরের কেউ টেরও পেল না, সুলতান স্বশরীরে কায়রোতে অবস্থান করছেন।

মহলে প্রবেশ করেই আলীকে নিয়ে তিনি এক কামরায় ঢুকে গেলেন। বিশ্বস্ত এক গার্ডকে ডেকে বললেন, 'আমার ঘোড়া পেছনে সরিয়ে নিয়ে যাও। আমি এসেছি, এ কথা যেন কেউ জানতে না পারে।'

আলী কামরার দরজা বন্ধ করে দিয়ে বললেন, 'সুলতান, এখন কি করতে চান?'

'আগে তুমি ছদ্মবেশ নাও। তারপর তোমার দপ্তরে গিয়ে সন্দেহভাজনদের তালিকা নিয়ে এসো। পুরো তালিকায় আমি ভালভাবে চোখ বুলিয়ে নিতে চাই।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ছদ্মবেশ নিয়ে পথে নামলেন আলী। একটু পরে ফিরে এলেন তালিকা নিয়ে।

সুলতান গভীর মনযোগে একটি একটি করে নাম ও

ঠিকানা মনের গভীরে গেঁথে নিতে লাগলেন। এক সময় আলীকে বললেন, 'আলী, আল ইদরিসকে একটু ডেকে আনবে?'

আল ইদরিসকে ডেকে আনলেন আলী। এই সে আল ইদরিস, যার দুই যুবক ছেলেকে গাদ্দাররা ধোঁকায় ফেলে খুন করেছে।

আল ইদরিস আসতেই সুলতান আইয়ুবী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ছেলেদের প্রসঙ্গ তুলে আল ইদরিসকে শান্ত্বনা দিলেন তিনি।

'যদি আমার সন্তানরা যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হতো তবে আমি খুশি হতাম। আমার আফসোস শুধু এটুকুই, তারা দুশমনের প্রতারণার ফাঁদে পড়ে প্রাণ দিল।' আল ইদরিস বললেন, 'জানি এখন সন্তানের জন্য শোক করার সময় নয়। আপনি আমাকে কেন ডেকেছেন সে কথা বলুন।'

'আলীর কাছ থেকে কায়রোর অবস্থা আমি শুনেছি। এবার আপনার কাছ থেকে শুনতে চাই। ষড়যন্ত্রকারীদের সম্পর্কে আপনি কতদূর কি জানেন বলুন।'

আল ইদরিস যা জানেন আদ্যোপান্ত সুলতানকে জানালেন। আলীর রিপোর্টে এমন কিছু নাম ছিল যা সুলতানের ধারনার বাইরে। তিনি আল ইদরিসের কাছে কয়েকটি নাম উল্লেখ করে বললেন, 'এদের সম্পর্কে আপনার অভিমত বলুন।'

আল ইদরিস তার মতামত পেশ করলেন। সুলতান বললেন, 'আমি গোপনে কায়রো প্রবেশ করেছি কিছু বিশেষ কাজে। আমি যে এসেছি এ কথা কাউকে বলবেন না।

তালিকার এ নাম কটি মুখস্ত করে নিন। এরা সবাই রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, কিন্তু আলীর রিপোর্ট সত্য হলে এদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধা করবো না আমি। আপনি খুব ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করুন এবং এদের ব্যাপারে খোঁজ খবর নিন। কাল সকালে আপনি আপনার মতামত জানাবেন।'

আল ইদরিস বিদায় নিলে তিনি আবার তালিকা নিয়ে বসলেন। যতই পড়ছেন ততই বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে তার চেহারা। এক সময় আলীকে বললেন, 'আলী, এখানে তুমি যাদের তালিকা দিয়েছো তাদের ব্যাপারে খুব ভাল করে খোঁজ খবর নিয়েছো তো?'

'একশো ভাগ নিশ্চিত না হয়ে কারো নামই আমি এ তালিকায় তুলিনি। আমার কাছে আরো একটি তালিকা আছে। সন্দেহ হলেও এদের ব্যাপারে এখনো নিশ্চিত কোন প্রমাণ জোগাড় করতে পারিনি বলে আপনার কাছে দেইনি। দেখতে চাইলে দেখতে পারেন।'

'না, ওটা এখন তোমার কাছেই থাক, যখন দরকার হবে, চেয়ে নেবো। তুমি বরং পুলিশ প্রধান গিয়াস কামালকে একটু ডেকে দাও।'

গিয়াস কামাল এলে সুলতান তার কাছ থেকেও গাদ্দারদের একটি তালিকা সংগ্রহ করলেন। আলীর দেয়া তালিকার সাথে সে তালিকা মিলিয়ে দেখলেন। আরো কয়েকজন বিশ্বস্ত এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির সাথে কথা বললেন। তাদের সুচিন্তিত মতামত শোনলেন এবং তাদেরকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলেন। এভাবে প্রচণ্ড ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল তার সারাটা দিন। সন্ধ্যায় রাস্তায় রেখে আসা ক্রাক

থেকে আগত বাহিনীর অধিনায়কের এক দূত এসে সুলতানের কাছে একটি চিঠি পেশ করল। তাতে সুলতানকে জানানো হয়েছে, সেনাবাহিনীর উত্তেজনা মোটেই কমেনি, তারা মিশরের সেনা ছাউনিতে হামলা করার জন্য বদ্ধপরিকর।

কায়রো শহরে রাতের আঁধার নেমে এল। অন্ধকারে আলীকে নিয়ে আবার ঘোড়ায় চাপলেন তিনি। বিশ্রামহীন দিনের পর শুরু হল বিশ্রামহীন রাত। যথাসময়ে খবর পেয়ে সুলতান ছুটলেন কায়রোর দিকে ধেয়ে আসা উত্তেজিত বাহিনীর উদ্দেশ্যে। কায়রো থেকে আট দশ মাইল দূরে থাকতেই তাদের পথ রোধ করে থামালেন তিনি। কায়রোর দিকে ছুটে চলা উত্তেজিত ধাবমান বাহিনী সাথে সাথে থমকে দাঁড়াল। তিনি সৈন্যদেরকে সেখানেই অবস্থান করতে আদেশ দিলেন। সুলতানের নির্দেশ পেয়ে সৈন্যরা সেখানে তাবু টানালো বিশ্রামের জন্য।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সৈন্য দল কায়রো থেকে আট দশ মাইল দূরে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের মাঝে প্রচণ্ড উত্তেজনা তোলপাড় করছে। কায়রোর বিদ্রোহী সৈন্যদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য ব্যগ্র-ব্যাকুল তারা।

তিনি সৈন্যদের মাঝে ঘুরে তাদের মনের আবেগ সতর্কতার সাথে লক্ষ্য করতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক অশ্বারোহী সৈন্যের কাছে থামলে আশেপাশের সৈন্যরা এসে জমায়েত হলো সেখানে। তিনি তাদের সঙ্গে হালকা মেজাজে আলাপ জুড়ে দিলেন। এক অশ্বারোহী সুলতানকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, ‘অপরাধ ক্ষমা করবেন সালারে আজম! এখানে আমাদের বিশ্রামের কোন দরকার ছিল না।

না থামলে আমরা রাতের প্রথম প্রহরেই কায়রো পৌঁছে যেতে পারতাম।'

'তোমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোন রকম বিশ্রাম না নিয়েই সরাসরি কায়রোর পথ ধরেছিলে। দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে এখন স্বাভাবিকভাবেই তোমরা ক্লান্ত!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'কায়রো ঢুকার আগে আমি তোমাদেরকে নিরিবিলি একটু বিশ্রাম দিতে চেয়েছি।'

'আমরা যুদ্ধ করে এসেছি এবং যাচ্ছিও যুদ্ধ করতে। আমাদের শিরার খুন এখনো ঠাণ্ডা হয়নি, বিশ্রামের কোন দরকার ছিল না আমাদের।' সেই আরোহী বললো।

'তুমি যুদ্ধ করতে যাচ্ছ?' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি তো তোমাদেরকে কায়রো নিয়ে যাচ্ছি! ওখানে তোমাদের পুরাতন বন্ধুরা আছে, যারা এক সময় তোমাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছে, যারা তোমাদের সুখ দুঃখের সাথী!'

'ওরা এখন আর আমাদের সাথী নেই, ওরাই এখন আমাদের শত্রু।' আরোহী বললো, 'ওরা নাকি মিশরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চায়, আমরা ওদের বিদ্রোহের সাধ চিরতরে মিটিয়ে দেবো!'

'বেঈমানরা কাফেরের চেয়েও ভয়ংকর। আমরা ওদের গাদ্দারীর পাওনা কড়ায় গণ্ডায় আদায় করবো।'

অন্য এক উত্তেজিত সৈন্য বললো, 'এ কথা কি সত্য নয় সালারে আজম! কায়রোতে বিশ্বাসঘাতকরা বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করছে?'

'হ্যাঁ, এ কথায় কিছু সত্যতা আছে ঠিক, তবে

অতিরঞ্জনও আছে।' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'আমি অপরাধীদের রেহাই দেবো না, শাস্তি ওদের পেতেই হবে।'

'আপনি পুরো বাহিনীকে কেমন করে শাস্তি দেবেন!' এক আরোহী বললো, 'শাস্তি আমরা দেবো। কমাণ্ডার কায়রোর সমস্ত ঘটনা আমাদের বলেছেন। আমাদের সঙ্গীরা সুবাকে শহীদ হয়েছে, ক্রাকে শহীদ হয়েছে। এ দুই শহরে আমাদের মা বোনদের সতীত্ব ও সম্ভ্রম নষ্ট হয়েছে। ক্রাকে এখনও হচ্ছে। আমাদের সঙ্গীরা ক্রাকের দুর্গপ্রাচীর থেকে ছুঁড়ে মারা অগ্নিগোলায় জীবন্ত দগ্ধ হয়েছে। আমাদের প্রথম কেবলার ওপর এখনও কাফেরদের পতাকা উড়ছে। আর আমাদের সৈন্যরা কায়রোতে শান্তিতে বসে বিলাসিতা ও ষড়যন্ত্র করছে? জেহাদী কাফেলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে চাইছে? যারা শহীদের রক্তের দাম দিতে জানে না, মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করতে জানে না, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার নেই।'

'আমরা জানতে পেরেছি, তারা ইসলামের শত্রুদের বন্ধু হয়ে গেছে। আমরা যতক্ষণ এই গাদ্দারদের নিজ হাতে হত্যা না করবো ততক্ষণ শহীদ ভাইদের আত্মা আমাদের ক্ষমা করবে না। এই আহতদের দেখুন, যাদেরকে আমরা সঙ্গে নিয়ে এসেছি, এদের কারো পা নেই, কারো হাত নেই। তার সাথীরা শত্রুদের বন্ধু হয়ে জাতির ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলবে, এটা দেখার জন্যই কি তারা পঙ্গু অবস্থায় অসহায়ের মত বেঁচে থাকবে?'

তার কথার প্রতিধ্বনি করে সৈন্যরা শোরগোল শুরু করে দিল, 'আমরা তাদের নিজ হাতে শাস্তি দেবো।'

এ শোরগোল শুনে আশপাশ থেকে আরো সৈন্য সেখানে

এসে জমা হতে লাগলো। তারা সবাই সুলতান আইয়ুবীর কাছে নিজ হাতে ঐসব সৈন্যদের শাস্তি দেয়ার দাবী জানাতে লাগলো। সুলতান গভীর মমতা নিয়ে সৈন্যদের এ আবেগ ও প্রেরণা উপলব্ধি করতে চেষ্টা করলেন।

তিনি সৈনিকদের এই আবেগ ঠাণ্ডা করতে বা তাদের মনে ব্যথা দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি বললেন, 'অবশ্যই আমরা তাদের শাস্তি দেবো, তবে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে নয়। আপনারা সবাই ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন। শাস্তি দেয়ার নাম করে আমরা কোন আহাম্মকী করতে চাই না। আমাদের উপদেষ্টারা আছেন, সালার এবং কমাণ্ডাররা আছেন, তাদের নিয়ে বসে আমি দেখছি এ ব্যাপারে কি পদক্ষেপ নেয়া যায়।'

তিনি নিজের তাবুতে ফিরে গেলেন এবং উপদেষ্টা ও কমাণ্ডারদের ডাকলেন। সবাই একত্রিত হলে তিনি বললেন, 'শত্রুর চাল এখন সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে। ওরা চায় আমরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করে ধ্বংস হয়ে যাই। কিন্তু সে সুযোগ আমি শত্রুদের দেবো না। পরবর্তী নির্দেশ না দেয়া পর্যন্ত এই উত্তেজিত সৈন্যরা এখানেই বিশ্রাম কবরে। গৃহযুদ্ধের হাত থেকে বাঁচতে হবে আমাদের। আমি আজ রাতে কায়রো যাবো। কেউ যেন না জানে আমি এখানেই নেই। সৈন্যদের উত্তেজনায় আপনারা শরীক হবেন না। আবার এমন কিছু করবেন না বা বলবেন না, যাতে তাদের আবেগে আঘাত লাগে।'

তিনি বিশেষভাবে বললেন, 'কায়রোয় আমাদের যে সব সৈন্য বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র করেছে, তারা আমার দৃষ্টিতে নিরপরাধ। ওদেরকে আমাদের সরকারী কিছু অফিসার ও

পদস্থ কর্মকর্তারা উত্তেজিত করেছে। এই কর্মকর্তাদের নির্দেশে ও ছত্রছায়ায় কায়রোসহ দেশের প্রধান শহরগুলোতে যৌনতা, নেশা ও বিলাস সামগ্রী ছড়ানো হয়েছে। এই চরিত্র বিধ্বংসী তৎপরতা সমাজে এতটা ব্যাপকভাবে জেঁকে বসেছে এ জন্য যে, আমাদের প্রশাসন দুষ্কৃতকারীদের গতিরোধ করার পরিবর্তে তাদের সহযোগিতা করেছে। আর এটা ওরা করেছে দুশমনের বেতন খেয়ে। যখন কোন জাতির প্রশাসন, সরকারের মন্ত্রী, উপদেষ্টা ও সচিবরা শত্রুদের হাতের পুতুল হয়, তখন সে জাতির সর্বনাশ এভাবেই ঘটে।

আমাদের সৈন্যদের একটি অংশ সুদানের ঊষর মরুভূমিতে যুদ্ধ করছে, প্রাণ দিচ্ছে। অথচ আমাদের প্রশাসন তাদের রসদপত্র, খাদ্য ও অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে ক্ষুধা ও পিপাসায় সৈন্যদের প্রাণ দিতে বাধ্য করছে।

এদের এ অপকর্মের ফলেই তকিউদ্দিনের সৈন্যরা আজ দুর্দশায় পড়েছে। অস্ত্রসমর্পণ না করে বাঁচার আর কোন পথ খুঁজে পাচ্ছে না সে। ওরা কেবল তকিউদ্দিনের বাহিনীকে পরাজিত করতে চাইছে তাই নয়, তারা জাতির সামনে সেনাবাহিনীর মর্যাদা ও সম্মান হেয় করার জন্যও উঠে পড়ে লেগেছে। তকিউদ্দিন পরাজিত হয়ে ফিরে এলে বা বন্দী হলে ওরা বলবে, দেখো পরাজিত সৈন্যরা ফিরে এসেছে। জাতির সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার কোন যোগ্যতাই এদের নেই।

এসব গাদ্দাররা মিশরের গদিতে বসার স্বপ্ন দেখছে। এ জন্যই তারা সেনাবাহিনীকে জাতির কাছে ছোট ও ঘৃণিত করতে চায়। তারা যখন জাতির ঘাড়ে সওয়ার হবে তখন যেন সেনাবাহিনী তাদের প্রতিরোধ করার মনোবল হারিয়ে

ফেলে এ জন্যই তারা এ চক্রান্ত করছে। এ অবস্থায় চুপচাপ বসে থাকার কোন অবকাশ নেই আমাদের।

যদি ওরা দ্বীনের জন্য এ চেষ্টা করতো তবে আমি সে বাহিনীতে সাধারণ সৈনিক হয়ে লড়াই করতাম! কিন্তু ওরা তো এতসব ষড়যন্ত্র করছে কেবল নিজের ভবিষ্যতের জন্য, নিজের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির জন্য। এ জন্য দুশমনের সাথে হাত মিলাতেও তাদের আপত্তি নেই। ওদের একমাত্র লক্ষ্য ছলে বলে কৌশলে নিজের ক্ষমতা লাভ। দ্বীন ও ঈমানের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। কিন্তু আমি চাই জাতিকে সেইখানে নিয়ে যেতে, যেখানে সে দ্বীনের শত্রুদের ভ্রুকুটি উপেক্ষা করে বীরের মত বুক ফুলিয়ে চলতে পারে। কুচক্রীদের ঘৃণ্য দৃষ্টি বর্তমান ও ব্যক্তি স্বার্থের দিকে, আমাদের দৃষ্টি জাতির ভবিষ্যত কল্যাণের দিকে।'

তিনি একটু থামলেন। এরপর রক্ষী প্রধানকে বললেন, 'আমার ঘোড়া প্রস্তুত করতে বলো।'

এরপর তিনি উপস্থিত উপদেষ্টা ও সালারদের দিকে ফিরে বললেন, 'আমি কায়রো যাবো। ওখান থেকে আমি তোমাদের জানাবো তোমরা কখন এখান থেকে রওনা হবে।'

তিনি কয়েকজন কমাণ্ডো লিডারকে তাঁর সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য দ্রুত প্রস্তুত হয়ে আসতে বললেন।

তারা উঠে দাঁড়ালে তিনি বললেন, 'খবরদার! আমার অনুপস্থিতির খবর যেন সৈনিকরা না জানে। আমার তাবু গুটাবে না, এ অবস্থায় রেখে দেবে। যাতে তাদের সন্দেহ না হয়, আমি এখানে নেই।'

কমাণ্ডো লিডাররা বেরিয়ে গেল। তিনি উপদেষ্টাদের

দিকে ফিরে বললেন, 'আমি আপনাদের স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, যে সব সৈন্য বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে আমি তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেবো না। আপনারাও কেউ তাদের বিরুদ্ধে কোন কটুক্তি করবেন না। কেউ যেন ওই সৈনিক ভাইদের ঘৃণার পাত্র মনে না করে সে চেষ্টা করুন।

আমি এ্যাকশন নেবো তাদের ওপর, যারা সেনাবাহিনীকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করেছে এবং জাতিকে বিপথগামী করার জন্য নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছে। আমি জানি, কায়রোর যে সৈন্যদের নামে আজ অভিযোগ উঠেছে তারা ষড়যন্ত্রের শিকার। এরাই যখন শত্রুর সামনে যাবে এবং শত্রুর তীর তাদের সম্ভাষণ জানাবে, তখন তাদের মনে পড়বে, তারা আল্লাহর সৈনিক। বিদ্রোহের পোঁকা তখন তাদের মাথা থেকে পালিয়ে যাবে। আপনারা আপনার সন্তানকে এইসব মুজাহিদদের দেখাবেন, যারা দ্বীনের শত্রুদের বিরুদ্ধে জিহাদ করছে। দেখবেন, তাদের মন স্বাভাবিকভাবেই জুয়ার দিক থেকে জিহাদের দিকে ফিরে আসবে।

আমি আপনাদের স্পষ্ট ভাষায় বলতে চাই, ইসলাম ও ইসলামী সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব ও সম্মান কেবলমাত্র এইসব জিন্দাদিল মুজাহিদরাই রক্ষা করতে পারে, অন্য কেউ নয়। খৃস্টান ও ইহুদীদের যুদ্ধের গতিধারা বলছে, দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য তারা সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাবে। তাদের চতুর্মুখী চক্রান্ত বলছে, ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ মুজাহিদদের বিরুদ্ধে তারা একটার পর একটা ষড়যন্ত্র করে যাবে। তাদের সকল তৎপরতার উদ্দেশ্য, দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করা। আমরা এই

অপতৎপরতা বরদাশ্‌ত করতে পারি না।

মনে রাখবেন, মুজাহিদদের মর্যাদা যখন মুসলমানদের কাছে হেয় বা খাটো হয়ে যায় তখন মুসলমানদের জাতীয় মর্যাদা এবং সম্মানও বিশ্ব দরবারে ভূলুণ্ঠিত হয়ে যায়। কোন কালেই কোন মুসলিম রাষ্ট্র শক্তিশালী সেনাবাহিনী ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। আমাদের আজকের ভুল, ইসলামকে আগামী কাল অন্ধকারে নিমজ্জিত করবে। আমাদের আজকের সঠিক পদক্ষেপ, আগামী প্রজন্মের জন্য বয়ে আনবে সাফল্যের স্বর্ণতোরণ। আমাদের আজকের দুর্বলতা ও ব্যর্থতা, আগামী প্রজন্মকে নিয়ে যাবে ক্ষতি ও ধ্বংসের অতল গহবরে।'

'মাননীয় আমীর!' একজন উপদেষ্টা বললেন, 'আমাদের ভাইয়েরা গাদ্দারীতে নাম লিখিয়ে আগামী প্রজন্মের নিশ্চিত বরবাদী ও ধ্বংসের কাজ তো সম্পন্ন করেই ফেলেছে! তারা এখন ক্রমাগত গোলাম ও দাসে পরিণত হতে থাকবে। স্বাধীনতা কাকে বলে, জাতীয় সম্মান কি জিনিস! এসব কোন অনুভূতিই তাদের থাকবে না। আমাদের কাছে কি এর কোন চিকিৎসা আছে?'

'এর চিকিৎসা হচ্ছে জাতির বিবেককে জাগ্রত করা!' সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'জাতির কোন নাগরিক আমাদের প্রজা নয়, জাতির প্রতিটি নাগরিক তার নিজ নিজ অবস্থানে একজন দায়িত্বশীল। তারা যদি বাদশাহর মত স্বাধীন ও সচেতন হয়, তবে জাতির অস্তিত্ব তারাই রক্ষা করবে। এ জন্য কোন ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য সম্মান থেকে বঞ্চিত করবেন না।

আমাদের নেতাদের মধ্যে বাদশাহ হওয়ার প্রতিযোগিতা

ও উন্মাদনা শুরু হয়েছে। এ জন্য তারা জাতির প্রতিটি নাগরিককে প্রজা বানিয়ে নিজেদের বাদশাহী ও ক্ষমতা প্রদর্শন করতে চায়। আমাদের মনে রাখতে হবে, মানুষ পশু নয় যে আমরা তাদের জানোয়ারের মত হাকিয়ে বেড়াবো। মানুষের মধ্যে বিবেক-বুদ্ধি আছে, আত্মসম্মানবোধ আছে এবং জাতীয় মর্যাদার অনুভূতি আছে। জাতির এই গুণগুলো বিকশিত থাকলে জাতি নিজেই চিন্তা করে নেয়, কিসে তার ভাল আর কিসে মন্দ। যদি জাতি মনে করে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর চেয়ে উত্তম আমীর তাদের সামনে আছে, যিনি ইসলামী সাম্রাজ্যকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর সুরক্ষিত রেখে রাজ্যের বিস্তৃতি ঘটাতে পারবেন, তাহলে জাতির যে কেউ আমার পথ আগলে যেন উচ্চারণ করে, সালাহউদ্দিন, তুমি এখন মসনদ খালি করো, আমরা তোমার চেয়ে যোগ্য ব্যক্তি খুঁজে পেয়েছি। জাতির মধ্যে এ চিন্তা চেতনা ও সাহসের বিস্তার ঘটুক, যাতে কেউ ফেরাউনের মত দাম্ভিক হতে না পারে। শাসকের বিরুদ্ধে কেউ কথা বললেই তার শিরচ্ছেদ করার দুঃসাহস যেন জন্ম নিতে না পারে কোন শাসকের মনে।'

রক্ষী ভেতরে প্রবেশ করলো। সালাম দিয়ে বললো, 'আমীর, আপনার ঘোড়া প্রস্তুত।'

ততোক্ষণে সঙ্গে যাবার জন্য যাদের নাম বলেছিলেন, তারাও তৈরী হয়ে চলে এল। সুলতান আইয়ুবী তাদের মধ্য থেকে বারোজনকে সাথে নিলেন। অন্যদের বললেন, 'তোমরা এ তাবুর চারপাশে পাহারা দিতে থাকবে। কেউ যেন জানতে না পারে, আমি এখানে নেই।'

তিনি সেই বারোজন কমাণ্ডোকে বললেন, 'মাইলখানেক

পূবে যে ছোট্ট পাহাড় দেখা যাচ্ছে তার ওপাশে গিয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করো। প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে যাবে। তোমাদের গতি দেখে কেউ যেন বুঝতে না পারে তোমরা সফরে যাচ্ছো। যাবে গোপনে এবং একেকজন একেক দিক দিয়ে যাবে।'

সফরসঙ্গী কমাণ্ডোরা বেরিয়ে গেলে তিনি দ্রুত তৈরী হয়ে বাইরে এলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ায় চেপে রওনা হয়ে গেলেন নির্দিষ্ট স্থানে।

সন্ধ্যায় সাদিয়া ইমামের জন্য মসজিদে খাবার নিয়ে এসে মাহমুদকে দেখে থতমত খেয়ে গেল এবং হেসে দিল।

মাহমুদ জিজ্ঞেস করলো, 'তুমি আমার জন্য খাবার আনবে না?'

সাদিয়া এর কোন জবাব না দিয়ে ইমামের খাবার রেখে দৌড়ে বাড়ি চলে গেল। কিছুক্ষণ পর রুটি ও বকরির দুধ নিয়ে ফিরে এলো সে।

সাদিয়া চলে যেতেই ইমাম সাহেব বললেন, 'এ মেয়েটি গ্রামের সবচে সুন্দরী মেয়ে। বয়স কম, কিন্তু মেয়েটি বেশ বুদ্ধিমতি। আফসোস! মেয়েটি শীগগীরই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে।'

'বিক্রি হয়ে যাচ্ছে!' অবাক হয়ে প্রশ্ন করল মাহমুদ, 'মানে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে?'

'না, বিয়ে নয়, বিক্রি।' ইমাম সাহেব বললেন, 'তুমি তো জানো, এ ধরনের গরীব লোকের সুন্দরী মেয়েরা বিয়ের নামে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিক্রি হয়ে যায়। কিন্তু সাদিয়ার ব্যাপারটা আরো ব্যতিক্রম। বলতে গেলে সে সরাসরিই বিক্রি

হচ্ছে। যে তাকে খরিদ করতে চায় সে সন্দেহভাজনদের একজন। লোকটি এখানকার বাসিন্দা নয়, মনে হয় যারা আমাকে হুমকি দিয়েছিল সে তাদেরই কেউ।'

মাহমুদ কেমন একটু বিমর্ষ হয়ে গেল, কিন্তু কিছু বলল না।

ইমাম সাহেবই মুখ খোললেন আবার, 'এই মেয়েকে তারা ট্রেনিং দিয়ে আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে, এ কারণেই তাকে বাঁচানো জরুরী হয়ে পড়েছে। মেয়েটি গরীব, কিন্তু সে একটি মুসলিম পরিবারের কন্যা। তার ইজ্জত ও সম্মানের হেফাজত করা ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব। আমি মেয়েটিকে কিছুতেই বিক্রি হতে দেবো না। সাদিয়ার বাবা আমার ভক্ত। কিন্তু সে গরীব ও অসহায়। মেয়েকে বাঁচানোর কোন সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু আমরা আছি। সাদিয়ার মান সম্মান ও সতীত্ব রক্ষার দায়িত্ব এখন আমাদের। এটা আমাদের ঈমানী ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব। সুতরাং কঠিন হলেও এর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার কোন সুযোগ নেই আমাদের।'

প্রকাশ্যে ছাত্র ও তালবে এলেম হলেও আসলে ইমাম সাহেবের সার্বক্ষণিক সঙ্গী ও গার্ড হযে গেল মাহমুদ। এখন নিয়মিত সাদিয়ার সাথে তার একাধিকবার দেখা হয়। দিন যতই যেতে লাগলো, মাহমুদের সঙ্গে সাদিয়ার ঘনিষ্ঠতাও বাড়তে লাগলো। বুদ্ধিমতি সাদিয়া দেশ গ্রামে কখন কি ঘটে সব খোঁজ খবর রাখতো। সাদিয়ার কাছ থেকেই কথায় কথায় মাহমুদ জেনে নিত আশপাশের সব গ্রামের সংবাদাদি। জেনে নিত স্থানীয় জনমত।

এর মধ্যে একদিন একটি ঘটনা ঘটল। সাদিয়া প্রতিদিন চারণভূমিতে বকরী ও উট চরাতে যায়। মাহমুদও সময় পেলেই ছুটে যায় সেখানে। একদিন মাহমুদ সাদিয়াকে জিজ্ঞেস করলো, 'যে লোকটা তোমাকে খরিদ করতে চায়, সে কে?'

এ কথায় সাদিয়ার চেহারা বিমর্ষ হয়ে গেল। বললো, 'আমি চিনি না; কোনদিন তাকে দেখিনি। কোথায় বাড়ি, কি করে কিছুই আমার জানা নেই। যেদিন আমাকে দেখতে এসেছিল, সেদিন এক পলকের জন্য সামান্য একটু দেখেছি, এর বেশি আর কিছু জানি না।'

'তাহলে সেই অচেনা লোকটি তোমাকে এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে দেখেও গেছে!'

সাদিয়ার মনটা আরো বিমর্ষ হয়ে গেল। মনে পড়ল লোকটা তাকে এমন ভাবে দেখেছে, যেন সে হাট থেকে গরু ছাগল কিনতে এসেছে।

সাদিয়া জানতো, তার যা রূপ যৌবন তাতে সে কোন লোকের স্ত্রী হতে পারবে না। তার আগেই আরবের কোন ধনী বণিক, কোন আমীর বা উজিরের দালাল ছুটে আসবে তাকে কিনে নিতে। গরীবের ঘরের রূপসীদের না পেলে এসব নবাবজাদাদের অন্দর মহলের শোভা বর্ধন হয় না, আভিজাত্য রক্ষা হয় না। তাই টাকার বাণ্ডিল নিয়ে দালালরা ঘুরে বেড়ায় গ্রামে গ্রামে। কোন ঘরে রূপসী সুন্দরীদের দেখলেই শুরু করে দরদাম। এভাবেই একদিন গ্রামের কুঁড়েঘর থেকে ওরা ঠাঁই পায় শাহী প্রাসাদে।

শোকেসে সাজানো তৈজসপত্রের মতই যুগ যুগ ধরে

ওরা বন্দী থাকে সুরম্য অট্টালিকায়। সেখানে ওদের কোন ঘর সংসার হয় না, ছেলে সন্তান থাকে না। কেবল দিনে দিনে বয়স বাড়ে, একদিন বুড়ী হয়, তারপর কোন রকম পিছুটান না রেখেই একদিন টুপ করে মরে যায়। তাদের জন্য এ পৃথিবীতে কান্নারও কেউ থাকে না, প্রার্থনা করারও কেউ না।

যৌবনের কয়েকটা দিন ওরা বেশ সমাদরে থাকে। নাচ গান শিখিয়ে আনন্দ স্ফূর্তির সামগ্রী বানিয়ে ওদের পরিবেশন করা হয় মেহমানদের সামনে। মেহমানরা তাদের গান শুনে, নাচ দেখে হাততালি দেয়, এটুকুই তাদের জীবন।

সাদিয়া তাদের গ্রামের এমন অনেক হতভাগ্য মেয়ের জীবন কাহিনী শুনেছে। জানে, তাকে নিয়েও হয়তো একদিন কাহিনী হবে, কিন্তু সমাজ ও সংসারে জায়গা হবে না তার। এ নিয়ে খুব ভাবতো সে। কারণ, গ্রামের সহজ সরল মেয়ে হয়েও সে ছিল খুব বুদ্ধিমতি। তাই সে তার জীবনের ভালমন্দ নিয়ে ভাবতো।

মাহমুদকে দেখার পর তার অন্তরে যে নতুন আবেগ এসে ভর করলো, সে আবেগ তার চিন্তাধারায় এনে দিল নতুন গতি। সে অনুভব করলো, সে যেমন মাহমুদকে ভালবাসে, মাহমুদও তেমনি ভালবাসে তাকে। তার মনে হলো, জীবন মানুষের একটাই, বন্দী পাখির মত ছটফট করে এ জীবনে বেঁচে থাকার সার্থকতা কি! তারচে জীবনকে ভালবেসে যে কটা দিন বাঁচা যায়, সে বাঁচায় আনন্দ আছে, সুখ আছে, সার্থকতা আছে।

না, সে আর বিক্রি হবে না। যদি মাহমুদ রাজি হয় তবে তাকে নিয়ে সে জীবনটাকে সুন্দর ও আনন্দময় করে তুলবে।

হোক সে জীবন সংক্ষিপ্ত। মানুষ আর কদিন বাঁচে! মহাকালের স্রোতধারায় মানুষের জীবন একটি বুদবুদ বৈ তো নয়! তার বুদবুদটুকু না হয় আরেকটু ছোট হলো!

কিন্তু এসব কি ভাবছে সে! তার বিক্রির কথা তো পাকাপাকি হয়ে গেছে। এখন যে কোন দিন খরিদ্দার এসে টাকা দিয়ে নিয়ে যাবে তাকে!

সে ব্যাকুল নয়নে মাহমুদের দিকে তাকালো। বললো, 'মাহমুদ, তুমি এ প্রসঙ্গ এখন কেন তুললে! কেন মনে করিয়ে দিলে আমি মানুষ নই, ধনীদের শখের সামগ্রী? কেন তুমি এভাবে আমার কষ্টের কথা আমাকে মনে করিয়ে দিলে?' তার কণ্ঠে কান্নার মিহিদানা।

'আমার মনের কষ্ট লাঘব করার জন্য। সাদিয়া, তুমি তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কারো কাছে বিক্রি হয়ে যাচ্ছো, এ কথা যতবার মনে হয় ততবার নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করে। ভাবি, একজন মুসলমান হিসাবে আমার কি কিছুই করার নেই? আল্লাহর বিধানে এভাবে নারীদের ক্রয়-বিক্রয় করার কোন সুযোগ নেই। বিক্রি তো দূরের কথা, এমনকি কন্যার অমতে তাকে বিয়ে দেয়ারও অধিকার নেই পিতা-মাতার। অথচ যারা কিনছে, যারা বিক্রি করছে এবং আমরা যারা এ অন্যায় দেখছি ও শুনছি, আমরা সবাই নিজেদের মুসলমান বলে দাবী করি।'

'আমার আব্বা একজন অসহায় ও গরীব মানুষ। সামাজিক কারণেই এ প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়া আব্বার পক্ষে সম্ভব নয়। আর আমাকে বিয়ে করার জন্য এখনো কেউ প্রস্তাবও দেয়নি. ফলে আব্বা নিরুপায়।'

'কিন্তু কেউ যদি বিয়ে করতে চায় তাতে কি তোমার আব্বা রাজি হবেন?'

'কেন হবেন না? আব্বা তো ইচ্ছে করে বা টাকার লোভে এ প্রস্তাব কবুল করেননি, করেছেন দায়ে ঠেকে, সামাজিক চাপের মুখে।'

'আমার কাছে কিছু টাকা থাকলে আমি তোমার আব্বার কাছে বিয়ের প্রস্তাব পাঠাতাম। কিন্তু তাকে খুশি করার মত কিছুই যে নেই আমার কাছে! আমার কাছে যা আছে তাতে তোমার বাবার মন ভরবে না।'

'আমার বাবার মন কিসে ভরবে আর কিসে ভরবে না, প্রস্তাব পাঠাবার আগেই কি করে তার ফয়সালা করলে! তুমি যা দিতে পারো তা আমাকে বলো, আমি বাবাকে রাজি করানোর দায়িত্ব নিচ্ছি।' বলল সাদিয়া।

'আমার কাছে তো এখন দেয়ার মত একমাত্র মন ছাড়া আর কিছু নেই সাদিয়া।' মাহমুদ বললো, 'জানিনা তুমি আমার মনের মূল্য বোঝ কি না?'

'যদি তোমার মনে আমার জন্য কোন ভালবাসা থাকে তবে তা আমার জন্য অনেক বেশি পাওনা।' সাদিয়া বললো, 'তুমি ঠিকই বলেছো, আমার বাবার কাছে এ মূল্য গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু আমি তোমাকে এ কথাও বলবো, আমার বাবা আমাকে বেঁচতে চান না। তার দুর্বলতা, তিনি গরীব ও সংসারের একমাত্র পুরুষ। আমার কোন ভাই নেই। সে লোক বাবাকে হুমকি দিয়েছে, যদি বাবা স্বেচ্ছায় আমাকে বিক্রি না করে তবে আমাকে ওরা কিডন্যাপ করে নিয়ে যাবে। সে ক্ষেত্রে বাবা আমাকেও হারাবে, টাকাও হারাবে। বাবা

লোকটাকে পছন্দ করে না, কিন্তু নিরূপায় হয়ে রাজি হয়েছে।'

'তোমার বাবার লোকটাকে পছন্দ না করার কারণ?' মাহমুদ জিজ্ঞেস করলো, 'এ গ্রামে তো মেয়েদের বিক্রি করা নতুন কিছু নয়?"

'বাবা বলেছেন, লোকটা মুসলমান নয়।' সাদিয়া বললো, 'আমিও বাবাকে বলে দিয়েছি, আমি কোন অমুসলিমের সাথে যাবো না।'

একটু চুপ করে থেকে সাদিয়া আবার মুখ খুললো। অস্থির কণ্ঠে বলে উঠলো, 'মাহমুদ, তুমি কি সত্যি আমাকে ভালবাসো। বলো, তুমি যদি চাও আমি তোমার সাথে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি।'

'তুমি জানো আমি তোমাকে সত্যি ভালবাসি। হ্যাঁ! আমিও প্রস্তুত!' মাহমুদ আবেগে বললো।

'তবে চলো আজ রাতেই আমরা এ গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যাই।' সাদিয়াও উৎসাহের সাথে বললো।

'না! আজ রাতে নয়!' মাহমুদের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, 'আমি আমার দায়িত্ব পূর্ণ না করে যেতে পারবো না।'

'কোন দায়িত্বের কথা বলছো?' সাদিয়া প্রশ্ন করলো।

মাহমুদ বিন আহমদ চমকে উঠলো। সাদিয়াকে সে দায়িত্বের কথা বলা যায় না। সে তার মুখ থেকে বেরিয়ে যাওয়া কথাকে গোপন করতে চেষ্টা করলো। সাদিয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে বললো, 'আমি ইমাম সাহেবের কাছে দ্বীনি তালিম নিতে এসেছি। সে শিক্ষা শেষ না করে আমি কোথাও যেতে পারব না।'

'জানিনা ততোদিনে আমার পরিণতি কোথায় গিয়ে

পৌঁছবে।' সাদিয়া আক্ষেপের সুরে বললো।

একটি মেয়ের জন্য মাহমুদ দায়িত্বের ব্যাপারে উদাসীন হতে রাজী নয়। তা ছাড়া মেয়েটি শত্রুদের গোয়েন্দা দলের কেউ নয় এ নিশ্চয়তা কে দেবে! এখনো তার ব্যাপারে আরো খোঁজখবর নেয়া দরকার আছে বলে মনে হলো তার। সাদিয়াকে তার ভাল লাগে ঠিকই, কিন্তু এসব ব্যাপারে নিশ্চিত না হয়ে হুট করে কিছু করে ফেলা সে ঠিক মনে করলো না। বললো, 'সাদিয়া, অস্থির হয়ো না, আল্লাহ আছেন, আমাদের ভাল-মন্দ তিনিই দেখবেন। সবুর করো, আমি তো তোমার কাছেই আছি। তেমন কিছু হলে তখন দেখা যাবে।'

গভীর রাত। মরুভূমির হালকা অন্ধকার ভেদ করে প্রাণপণে ছুটে যাচ্ছে চৌদ্দটা ঘোড়া। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অন্ধকার কেটে যাওয়ার আগেই কায়রো পৌঁছতে চাচ্ছিলেন। সুলতানের সাথে এ সফরে ছিলেন তার নিত্য সহচর এবং প্রতিটি বিজয়ের গর্বিত অংশীদার আলী বিন সুফিয়ান। আর ছিলেন শত প্রতিকুলতা, সংকট ও সংঘাতে পরীক্ষিত কয়েকজন বিচক্ষণ জানবাজ সহযোদ্ধা।

রাতের আঁধার কেটে যখন তারা তীব্র বেগে ছুটে চলেছেন কায়রোর দিকে, তখন তার সৈন্যরা পরম নিশ্চিন্তে তাবুতে গভীরে নিদ্রায় বিভোর। জাগ্রত প্রহরীরাও জানতে পারেনি, তাদের সালারে আজম তাদের চোখে ধুলো দিয়ে কখন চলে গেছে তাবুর বাইরে।

কায়রোর সেনাবাহিনী এবং অধিবাসীরা জানে সুলতান আইয়ুবী কায়রো থেকে অনেক দূরে ক্রাকের দূর্ভেদ্য দুর্গে

লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কেউ কল্পনাও করেনি, সুলতান আইয়ুবী তার বাহিনী নিয়ে কায়রোর এত কাছে অবস্থান করছেন। রাতের শেষ প্রহরে যখন সুলতান আইয়ুবী কায়রো প্রবেশ করেন তখনো ঘুম ভাঙেনি শহরবাসীর।

শহরে প্রবেশ করতে কেউ তাদের বাঁধা দেয়নি, কারণ সেখানে কোন প্রহরীই ছিল না।

সুলতান আইয়ুবী সাথীদের বললেন, 'শহরের নিরাপত্তা ভার যাদের কাঁধে, তারা কেউ পাহারায় নেই, এটা কি বিদ্রোহ নয়? সৈন্যরা আরামে ঘুমাচ্ছে, তারা নির্ভয় ও দায়িত্বহীন। যে দেশের সৈন্যরা দু'টি রণাঙ্গণে প্রাণপণ যুদ্ধে লিপ্ত, সে দেশের সৈনিকদের এ নির্লিপ্ততা ও দায়িত্বহীনতাই এক ধরনের বিদ্রোহ।'

কায়রোতে তাঁর নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছলেন সুলতান। সারা রাতের পথশ্রমে ক্লান্ত তিনি, কিন্তু এক মুহূর্তও বিশ্রামের সুযোগ নিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে মিশরের প্রতিরক্ষা প্রধানকে ডেকে পাঠালেন। প্রতিরক্ষা প্রধান সুলতান আইয়ুবীকে দেখে ভয়ে থতমত খেয়ে গেল।

তিনি কায়রোর প্রতিরক্ষা প্রধানকে নিয়ে বসলেন। সুলতান আইয়ুবী তাকে বললেন কায়রোর আভ্যন্তরীণ অবস্থার বিশদ রিপোর্ট পেশ করতে। প্রতিরক্ষা প্রধানের বক্তব্য শেষ হলে সুলতান কয়েকজন সেনা অফিসারের নাম ধরে তাদের অবস্থা জানতে চাইলেন। প্রতিরক্ষা প্রধান সন্দেহভাজনদের একটি তালিকা সুলতানের হাতে তুলে দিলেন।

সবকিছু শোনার পর সুলতান আদেশ দেয়া আরম্ভ করলেন। বললেন, 'যে সকল সামরিক অফিসার সন্দেহভাজন

তাদেরকে কেন্দ্রীয় কমাণ্ডে নিয়ে যাও। এই মুহূর্তে সেনা ছাউনিতে যত সৈন্য আছে সবাইকে সূর্য উঠার আগেই যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে বলো। সৈন্যদের বলবে, আমি কায়রোতে এসেছি ওদের নিয়ে যেতে এবং এখুনি তাদেরকে আমার সাথে ময়দানে রওনা হতে হবে।'

তিনি প্রতিরক্ষা প্রধানকে আরও কিছু জরুরী নির্দেশ দিয়ে বিদায় করলেন। ফিরলেন আলী বিন সুফিয়ানের দিকে। আলী বললেন, 'সুলতান, আমার জন্য আপনার নির্দেশ কি?'

সুলতান আইয়ুবী তাকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বিদায় করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই সেনা ব্যারাকে হুলস্থুল পড়ে গেল। ঘুম থেকে তুলে সৈন্যদের জানানো হলো সুলতানের আগমন বার্তা ও নির্দেশ। সন্দেহভাজন অফিসারদেরকে সুলতান আইয়ুবীর হেডকোয়ার্টারে পাঠানো হলো। ঘটনার আকস্মিকতায় তারা ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেল। যেই তারা শুনল, সুলতান আইয়ুবী এসে গেছেন, অমনি তাদের বুক ধরফড় শুরু হলো।

তারা সুলতানের ঘোড়া চিনতে পারল এবং এখন তাদের করনীয় কি এ কথা ভাবার আগেই তাদের বলা হলো হেডকোয়ার্টারে সুলতানের কাছে রিপোর্ট করতে। তালিকাভুক্ত অফিসাররা হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করলো। তাদের বলা হলো, 'সুলতান গুরুত্বপূর্ণ কাজে ব্যস্ত আছেন। আপনাদের তিনি জরুরীভাবে তলব করেছেন। আপনারা বসুন, কাজ শেষ হলেই তিনি আপনাদের সাথে দেখা করবেন।'

উপস্থিত অফিসারদের কেউ এখনো সুলতান আইয়ুবীকে চোখে দেখেনি। সুলতান আইয়ুবীও এখনি অফিসারদের সঙ্গে দেখা দিতে চাচ্ছিলেন না। তিনি তাদেরকে এখানে ডেকে এনেছেন, যাতে সেনাবাহিনী যাত্রা করার আগ পর্যন্ত সৈন্যদের সাথে তাদের দেখা না হয় এবং কোন অফিসারের মনে কোন দুরভিসন্ধি থাকলেও তা বাস্তবায়নের সুযোগ না পায়।

তখনও ভোরের আলো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সৈন্যদেরকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। প্রথমে পদাতিক বাহিনী, তারপরে অশ্বারোহী বাহিনী এবং তারও পিছে খাদ্য ও রসদ বহণকারী উটের কাফেলা।

সুলতান আইয়ুবী তার সেনাদের বিশেষভাবে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। সেই ট্রেনিং অনুযায়ী জরুরী অভিযানের আহ্বান এলে সৈন্যরা এক ঘণ্টার মধ্যেই রসদ সামানসহ যাত্রা শুরু করে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতে পারতো।

সুলতান আইয়ুবী তার ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলেন, তাঁর সঙ্গে মিশরের প্রতিরক্ষা প্রধান। সুলতান আইয়ুবী সৈন্যদের এক একটি সারির সামনে দিয়ে যেতে লাগলেন এবং তাদের দেখতে লাগলেন। তাঁর মুখে ফুটে উঠলো তৃপ্তির হাসি। তিনি সৈন্যদের পাশ দিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, 'সাবাস! সাবাস নওজোয়ান! হে আল্লাহর সেনাদল, তোমদের ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক।'

সুলতান সালাহউদ্দিনের নিজস্ব একটা বৈশিষ্ট্য ও ব্যক্তিত্ব ছিল। তার প্রভাব অনুভব করতো প্রতিটি সৈনিক। তাদের সঙ্গে সহাস্য বদনে কথা বলছেন তাঁদের আমীর ও সর্বাধিনায়ক, এ আনন্দের তৃপ্তির প্রভা ছড়িয়ে আছে প্রতিটি

সৈনিকের চেহারায়। তাদেরকে ময়দানে নেয়ার জন্য ছুটে এসেছেন তাদের শ্রদ্ধেয় আমীর, এ কথা ভেবে গর্বে ফুলে উঠছিল তাদের বুক।

পর্যবেক্ষণ শেষ করে সুলতান আইয়ুবী সৈনিকদের সামনে এক জ্বালাময়ী ভাষণ দিলেন। সে ভাষণে যুদ্ধের জন্য উদ্বেলিত হয়ে উঠল প্রতিটি হৃদয়।

সৈনিকদের উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর সৈনিকেরা! আল্লাহর নামে জীবন বিলিয়ে দেয়ার জন্য হে পাগলপারা মুজাহেদিন! ইসলামের সুনাম তোমাদের অস্ত্রকে ডাকছে। সুবাকের ময়দানে তোমরা কাফেরের সুদৃঢ় দুর্গ বালির পাহাড়ের মত ধ্বসিয়ে দিয়েছো। তোমরা ক্রুসেডারদের মরুভূমিতে কবর দিয়ে নিজেদের জন্য জান্নাতুল ফেরদৌসে ক্রয় করে নিয়েছো। তোমাদের প্রিয় বন্ধুরা তোমাদের সামনে শহীদ হয়েছে। তোমরা নিজ হাতে তাদের দাফন করেছ।

সেইসব কমাণ্ডো সৈন্যদের কথা স্মরণ করো, যারা অবলীলায় শত্রুর বেস্টনী ভেদ করে ঢুকে গেছে তাদের মধ্যে এবং শাহাদাতের পেয়ালা পান করে চলে গেছে আল্লাহর দরবারে। জানাজার নামাজ পড়ার জন্যও তাদের খুঁজে পাওনি তোমরা। তাদের লাশ তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা একটু চিন্তা করো, সে লাশের সাথে কেমন ব্যবহার করেছিল দুশমন?

শহীদের এতিম শিশুদের কথা চিন্তা করো। তাদের বিধবা স্ত্রীদের কথা স্মরণ করো। স্মরণ করো সেই জিন্দাদিল মুজাহিদদের, আল্লাহর দ্বীনের জন্য যারা বিলিয়ে দিয়েছিল তাদের দুনিয়াবী সব সাধ-আহলাদ, ধন-সম্পদ এবং এমনকি

নিজের প্রাণটুকু।

আজ শহীদের আত্মা তোমাদেরকে ডাকছে যুদ্ধের ময়দানে। তোমাদের বীরত্বগাথা তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে আবার ময়দানে ঝাপিয়ে পড়তে। শক্ররা ক্রাক দুর্গের সুদৃঢ় পাঁচিলের ওপর থেকে আগুন ছুড়ে ভষ্মিভূত করেছে তোমাদের ভাইদের। তোমরা যদি সে দৃশ্য দেখতে তবে তোমরা মাথা ঠুকেই ভেঙে ফেলতে ক্রাকের দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রাচীর।

'হে ইসলামের নিশান বরদার! ক্রাক দুর্গের মধ্যে তোমাদের বোন ও কন্যাদের সতীত্ব নষ্ট করছে দুশমন। তোমাদের বৃদ্ধ পিতাদের থেকে পশুর মত শ্রম আদায় করা হচ্ছে। যুবকদেরকে ঠেলে দেয়া হয়েছে কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে। মাকে তার শিশু সন্তানদের থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছে।

একদিন আমরা পাথরের দুর্গ ভেঙ্গেছি; আজ মাটির কেল্লা আমাদের পথ আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ক্রাকের কেল্লার দেয়াল ভাঙতে ব্যর্থ হয়ে আমি এসেছি তোমাদের কাছে।'

সুলতানের কণ্ঠে উপচে পড়া আবেগের জোয়ার। তিনি দুই হাত উর্ধে তুলে আত্মসমর্পনের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছি, এই অপরাধে তোমরা আমার বুক তীর মেরে ঝাঁঝরা করে দিতে পারো, আমি কোন আপত্তি করবো না। কিন্তু আমার প্রাণ নেয়ার আগে আমি শুধু শুনতে চাই, তোমরা ক্রাকের দুর্গে ইসলামের বিজয় নিশান উড়িয়েছো। তোমাদের সতীত্ব নষ্ট হওয়া মেয়ে ও বোনদের কান্না থেমে গেছে। তাদের বুকে জড়িয়ে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছো তোমরা।'

আইয়ুবী বক্তৃতা করছিলেন, সৈনিকরা তন্ময় হয়ে শুনছিলো সেই জ্বালাময়ী ভাষণ। তাদের শিরায় শিরায় যেন বিদ্যুৎ প্রবাহ বয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, কেবল আরোহীরা নয়, আবেগ ও উন্মাদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে তাদের ঘোড়াগুলোও।

আরোহীরা সকলেই চুপচাপ। কিন্তু ঘোড়ার হ্রেষা ও চঞ্চলতা বাড়ছিল। আরোহীরা জোরে লাগাম টেনে ধরে তাদের অস্থিরতা রোধ করছিল। জবান বন্ধ থাকলেও আরোহীদের চোখে মুখে প্রকাশ পাচ্ছিল আবেগের রক্তিম আভা। সুলতান আইয়ুবীর প্রতিটি বাক্য যেন তীরের মত তাদের অন্তরে বিদ্ধ হচ্ছিল। জেহাদী জযবার বন্যা এসে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিচ্ছিল তাদের মনে জমে থাকা বিদ্রোহের আগুন। সুলতান আইয়ুবীর উদ্দেশ্য সফল হচ্ছিল।

'মুসলিম সাম্রাজ্যের ইজ্জত ও আবরু রক্ষীরা! তোমরা কাফেরদের মনে আতংকের ভয়ানক ঝড় সৃষ্টি করো বলে ওরা তোমাদের তলোয়ারের ধার ভোঁতা করতে চায়। এ জন্য তারা মদ, হাশিশ ও তাদের সুন্দরী মেয়েদের লেলিয়ে দিয়েছে তোমাদের পেছনে। তোমরা বুঝতে পারোনি, ক্রুসেডরা তাদের এক মেয়ের রূপের আগুন দিয়ে হাজার হাজার মুজাহিদের ঈমানী চেতনা পুড়ে ছারখার করে দিচ্ছে। ওরা আমাদের মাঝে একটি বেহায়া মেয়ে পাঠিয়ে আমাদের শত শত মেয়েকে বেহায়া বানিয়ে দিচ্ছে। আজ সময় এসেছে আমাদের মা বোন কন্যাদের সম্ভ্রম রক্ষা করার। তোমরা দৃঢ় পায়ে এগিয়ে যাও, তোমাদের মাতা ভগ্নি কন্যাদের মান সম্মান ইজ্জত রক্ষা করে প্রমাণ করো তোমরা মুসলিম।

তোমরা ক্রাকের রণাঙ্গণে রওনা হতে যাচ্ছো। ওখানে গেলে তোমরা দেখতে পাবে দুর্গের চারপাশে কুরআনের ছেঁড়া পাতা উড়ে বেড়াচ্ছে। সেখানকার মসজিদগুলো খৃষ্টানরা বাথরুমে পরিণত করেছে। যে ক্রুসেডাররা তোমাদের ভয়ে সুবাক থেকে পালিয়েছিল, তারা আজ ক্রাকে বসে গলা ফাটিয়ে হাসছে। যে ঈমানের বলে সুবাক তোমরা দখল করেছিলে, সেই ঈমান ও জযবা নিয়ে এগিয়ে যাও, ক্রাকও তোমাদেরই হবে।'

সুলতান আইয়ুবী সেনাবাহিনীর ওপর এই দোষারোপ করলেন না, তারা বিভ্রান্ত হয়ে গেছে এবং তারা বিদ্রোহী বা গাদ্দার। তিনি কারো ওপর কোন সন্দেহ করলেন না, ইশারা ইঙ্গিতেও কটাক্ষ করলেন না কাউকে। তার পরিবর্তে সৈন্যদের মনে জাগিয়ে দিলেন জেহাদী জযবা ও বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর দুরন্ত সাহস।

ভোরের উত্তাপ তখনো তীব্র আকার ধারণ করেনি, কিন্তু সৈন্যদের আবেগ উত্তপ্ত হয়ে উঠল আইয়ুবীর বক্তৃতায়। অভিভূত হয়ে সৈন্যরা লক্ষ্য করলো সমস্ত সেনাদল একটি জ্বলন্ত মশালে পরিণত হয়েছে।

সুলতান আইয়ুবী এরপর কমাণ্ডারদের নিয়ে বসলেন। অভিযান সম্পর্কে তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বললেন, 'এখান থেকে সোজা ক্রাকের পথ ধরবে না। প্রথমে সুদানের পথে কিছু দূর এগিয়ে যাবে। মরুভূমিতে নেমে যখন বুঝবে কোন অনুসরণকারী পিছু নেয়নি, তখন বাহিনীর মুখ ঘুরিয়ে দেবে ক্রাকের দিকে।'

তিনি তাদেরকে কায়রো থেকে ক্রাকের দিকে যাওয়ার

এমন এক রাস্তা বাতলে দিলেন, যাতে ক্রাকের রণাঙ্গণ থেকে আসা সৈন্যদের সামনে তাদের পড়তে না হয়। ক্রাক থেকে আসা বাহিনীর যে সব অফিসারকে তিনি সঙ্গে এনেছিলেন তাদেরকে তিনি এই বাহিনীর সঙ্গে পাঠালেন। যাত্রার পূর্বে এইসব কমাণ্ডারকে আরো কিছু গোপন নির্দেশ দিলেন।

সৈন্যরা ক্রাকের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেল। কায়রোর আকাশ বাতাস ধ্বনিত করে আওয়াজ উঠলো, 'আল্লাহু আকবার।' সুলতান আইয়ুবীর প্রশান্ত চেহারায় খেলা করতে লাগলো কৃতজ্ঞতা ও সহমর্মিতার আবেগ।

যখন সৈন্যরা তাঁর চোখের দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল, তখন তিনি এক কাসেদকে দিয়ে কায়রোর অদূরে ক্রাক রণাঙ্গণ থেকে আগত সেনা ক্যাম্পে চিঠি পাঠালেন। কাসেদ দ্রুত রওনা হয়ে গেল ক্যাম্পের উদ্দেশ্যে। চিঠিতে বলা হলো, 'পয়গাম পাওয়া মাত্র সেনাবাহিনী নিয়ে দ্রুত কায়রো চলে এসো।'

কায়রো থেকে ক্যাম্পের দূরত্ব ছিল মাত্র আট দশ মাইল। অল্প সময়ের মধ্যেই কাসেদ ওখানে পৌঁছে গেল। চিঠি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেনাবাহিনী রওনা হলো কায়রোর উদ্দেশ্যে। সূর্যোদয়ের ঘন্টা দুই পরে সৈন্যদের প্রথম দলটি কায়রো এসে পৌঁছল। এরপর একে একে সব দলই কায়রো সেনানিবাসে প্রবেশ করল।

এ সৈন্যদের সেই সব সিটে থাকার ব্যবস্থা হলো, যেগুলো আজ সকালে ক্রাক অভিমুখে রওনা হয়ে যাওয়া সৈন্যরা খালি করে দিয়ে গেছে। আগত সৈন্যরা খুব উত্তেজিত

ছিল। আলী বিন সুফিয়ান তাদেরকে শান্ত করার ব্যবস্থা করলেন। তিনি তাদের জানালেন, 'কায়রোর সৈন্যদের ক্রাক রণাঙ্গণে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে।'

তারা যখন শুনল, একটু আগে বিদ্রোহের অপরাধে যাদের খুন করার জন্য তারা পাগলপারা ছিল, বিদ্রোহের পরিবর্তে সেই সব সৈনিকরা জেহাদের ময়দানে রওনা হয়ে গেছে তখন তারা তাদের ভুল বুঝতে পারল এবং সুলতান আইয়ুবীর বিচক্ষণতায় অভিভুত হয়ে গেল।

আলীর সহযোগিতায় এভাবেই সুলতান আইয়ুবী সুকৌশলে মিশরে সেনা বিদ্রোহের পথ বন্ধ করলেন এবং সেনা বিদ্রোহের কারণে মিশরে গৃহযুদ্ধের যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল তা নিঃশেষ করে দিলেন।

কিন্তু সুলতানের কাছে সমস্যার কোন অভাব ছিল না। একটি সমস্যা থেকে তিনি মুক্তি পেলেন ঠিকই, কিন্তু আরো অসংখ্য সমস্যার পাহাড় তাঁর মাথায় বোঝা হয়ে রইল। তিনি উচ্চপদস্থ সেনা অফিসারদের ডেকে সেনাবাহিনীকে নতুন করে বিন্যাস করতে বললেন।

এরপর ডাকলেন প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রধানকে। তার কাছে তিনি জানতে চাইলেন, 'সীমান্ত রক্ষীরা কোথায় কি পরিমাণ আছে?'

প্রতিরক্ষা বাহিনী প্রধান সুলতানের কাছে সীমান্ত এলাকার বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করল। সুলতান বললেন, 'বিভিন্ন জায়গায় আরো সৈন্য পাঠাও।' তিনি কোথায় কত সৈন্য পাঠাতে হবে সব বুঝিয়ে দিলেন তাকে।

সুলতানকে বলা হয়েছিল, 'সীমান্ত রক্ষীরা দেশের সম্পদ বাইরে পাচারে শত্রুদের সহযোগিতা করছে।' সুলতান আইয়ুবী আলী বিন সুফিয়ানের কাছ থেকে সীমান্তের দুর্নীতিপরায়ণ কমাণ্ডারদের তালিকা নিলেন এবং তাদেরকে সীমান্ত এলাকা থেকে প্রত্যাহার করে কায়রো আসার পরিবর্তে ক্রাকের যুদ্ধ সেক্টরে যোগ দেয়ার হুকুম দিলেন।

সেনা বিদ্রোহ দমন এবং গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনা নাকচ করার পরও সুলতান আইয়ুবীর সামনে কয়েকটি গুরুতর সমস্যা রয়েই গেল। যেমন, ক্রাক থেকে ফিরে এলেও ক্রাক জয়ের চিন্তা তাঁর মাথায় রয়েই গেল। ওদিকে সুদানের রণাঙ্গণে ভাই তকিউদ্দিন যে গ্যাঁড়াকলে আটকে পড়েছে তাকে উদ্ধার করার কঠিন দায়িত্বও তাকেই পালন করতে হবে। গোয়েন্দা প্রধানের রিপোর্ট অনুযায়ী মিশরের অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে এ মুহূর্তে তাকে আরো কয়েকটি কাজ করতে হবে।

প্রথমত, কায়রোয় খৃস্টানরা যে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন শুরু করেছে এবং যে আগ্রাসনের ফলে মুসলিম তরুণ ও যুব সমাজে ইতিমধ্যেই ব্যাপক ধ্বস নেমে এসেছে তার সয়লাব রোধ করা।

দ্বিতীয়ত সীমান্তের সেনা বিভাগে যে ফুটো সৃষ্টি হয়েছে সে ফুটো বন্ধ করে সীমান্তের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মজবুত করা।

তৃতীয়ত এবং সবচেয়ে ভয়ংকর ও জটিল সমস্যা হচ্ছে সীমান্তবর্তী অঞ্চলসহ দেশের প্রত্যন্ত এলাকার গ্রামগুলোতে যে ধর্মীয় ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে তার মোকাবেলা করা। কাজ অনেক, কিন্তু সময় কম।

আইয়ুবী অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায় সামগ্রিক পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করলেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করলেন। বিশেষ করে মিশরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি যে যুগান্তকারী ও বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন তা দেখে তাঁর অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুবান্ধব এবং একান্ত বিশ্বস্ত ভক্ত অনুরক্তরাও চমকে উঠল।

গত রাতে ক্রাকের রণাঙ্গন থেকে আসা বাহিনীকে কায়রো থেকে আট দশ মাইল দূরে অবস্থানের নির্দেশ দিয়ে ফিরে এসেই সুলতান আইয়ুবী গোয়েন্দা বাহিনী প্রধান আলী বিন সুফিয়ান এবং পুলিশ বাহিনী প্রধান গিয়াস কামালের দেয়া রিপোর্ট নিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিলেন এবং দরজা বন্ধ করে গভীর মনোনিবেশ সহকারে তা পাঠ করেছিলেন। এইসব রিপোর্টে ইতিমধ্যে সীমান্তের কোন কোন সেনা অফিসার ও কমাণ্ডার খৃস্টানদের খপ্পরে পড়ে গেছে তার বিস্তারিত তালিকা ছিল।

আরেকটি তালিকায় ছিল প্রশাসনের সেইসব উচ্চপদস্থ অফিসার ও কর্মকর্তাদের নাম ঠিকানা, যারা খৃস্টানদের বন্ধুত্ব কবুল করে নিয়েছিল এবং খৃস্টানদের অর্থ, নারী ও মদের প্রভাবে নৈতিক অধপতনের শিকার হয়েছিল। এই তালিকায় এমন সব ব্যক্তিদের নামও ছিল, যারা রাষ্ট্রের মজলিশে শুরা এবং প্রশাসনের সর্বোচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি।

সারা রাত ধরে তিনি খুটিয়ে খুটিয়ে সবকটি নাম পরীক্ষা করলেন। ভোরে কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই মিশরের বাহিনীকে ক্রাকে পাঠিয়ে দিয়ে এবং অন্য দলকে সীমান্তে

প্রেরণ করে অতর্কিত অপারেশন চালিয়ে গ্রেফতার করলেন রাষ্ট্রের ও প্রশাসনের কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে। তাদের মধ্যে দুই তিনজন কেন্দ্রীয় মজলিশে সুরার সদস্য এবং উচ্চ পর্যায়ের সচিবও ছিলেন।

তাদের বাড়ী থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ-সম্পদ, স্বর্ণ, মনিমুক্তা ও মূল্যবান বিদেশী সামগ্রী উদ্ধার হলো। প্রত্যেকের বাড়িতে পাওয়া গেল ইহুদী এবং খৃস্টান মেয়ে। তাদেরও গ্রেফতার করা হলো। তালিকাভুক্ত অন্যান্য অফিসারদের গৃহ থেকেও অনুরূপ মালপত্র, মেয়ে এবং চাকর-চাকরানী বেশে লুকিয়ে থাকা সুদানী, ইহুদী এবং খৃস্টান গোয়েন্দাদের উদ্ধার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতদের কোন রকম জিজ্ঞাসাবাদ ছাড়াই কারাগারে প্রেরণ করা হলো। সুলতান আইয়ুবী কারারক্ষীকে আদেশ দিলেন, 'এরা কেউ রাজবন্দীর মর্যাদা পাবে না। এরা সবাই রাষ্ট্রীয় ক্রিমিনাল, কারাগারে ক্রিমিনালদের সাথে যে ব্যবহার করা হয় এদের সাথেও সেই ব্যবহারই করবে।'

এই গ্রেফতারীর ফলে কেন্দ্রীয় কমাণ্ড কাউন্সিল ও মজলিশে শূরার কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ শূন্য হয়ে গেল। এইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে মিল্লাতে ইসলামিয়ার সেবা করে যাচ্ছিলেন। সমাজে তারা আইয়ুবীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত এবং ইসলামের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হিসাবে পরিচিত এবং সম্মানিত ছিলেন। বিভিন্ন পদে কেউ কেউ এমনও ছিলেন যাদের কোন বিকল্প নেই বলে মনে করা হতো। কিন্তু গোয়েন্দা বিভাগের সুস্পষ্ট অভিযোগের ফলে এইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের গ্রেফতারের ব্যাপারে তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত ও

দ্বিধান্বিত হলেন না।

এই গ্রেফতারী তৎপরতা শেষ করতে মাত্র ঘন্টা দুই সময় নিলেন তিনি। দুপুরের আগেই সমুদয় কাজ শেষ করে তিনি যখন খেতে এলেন তখন কোন কোন উপদেষ্টা উদ্বেগাকুল কণ্ঠে বললেন, 'সুলতান! যে ভয়ংকর পদক্ষেপ আপনি নিলেন এর পরিণতি কি হবে তাই ভাবছি আমরা। আমাদের এখন যে কোন ভয়াবহ পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।'

সুলতান উপস্থিত উপদেষ্টাদের দিকে তাকালেন। বললেন, 'যাদের অক্লান্ত পরিশ্রম, ত্যাগ-তিতীক্ষা ও বুদ্ধি পরামর্শ নিয়ে ইসলামী সাম্রাজ্যের এই ভিত গড়ে তুলেছিলাম, দীর্ঘদিনের সেইসব পরীক্ষিত বন্ধু ও সাথীদের নিজ হাতে গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠাতে আমার চেয়ে আর কারো বেশি কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু প্রশ্ন যেখানে ইসলামের বৃহত্তর স্বার্থের, সেখানে ব্যক্তিগত অনুভূতির কোন মূল্য নেই। এর পরিণতি ভয়ংকর হতে পারে বলে আপনারা যে আশংকা করছেন আমি সে আশংকা উড়িয়ে দেই না। কিন্তু আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই, ব্যক্তি যত গুরুত্বপূর্ণই হোক, সে যখন মূল স্রোতধারা থেকে ছিটকে পড়ে তখন সেখানে আর কোন স্রোত থাকে না। ডোবার পানির মতই তখন তা বন্ধা ও দূষিত হয়ে পড়ে।

অন্যদিকে তার স্থলে নতুন করে যিনি দায়িত্বে আসেন, যদি তার যোগ্যতা আগের ব্যক্তির তুলনায় কিছু কমও হয়, কিন্তু তার মধ্যে থাকে ঈমানের মজবুতি, দায়িত্বে আন্তরিক ও নিবেদিতপ্রাণ, তবে আল্লাহর রহমত তার সেই ঘাটতি পূরণ

করে দেয়। কোন গাড়ি তার লাইনে ঠিক ভাবে চলতে থাকলে কেবল ড্রাইভার বদলের কারণে তার চলা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কোন কারণ নেই।'

এরপর সুলতান আইয়ুবী আক্রমণ চালালেন সেই নাজুক অঙ্গনে, যেখানে আক্রমণ চালাতে পৃথিবীর সকল কালের সকল শাসক অসংখ্যবার চিন্তা ভাবনা করে নেন। সবকিছু জেনেশুনেও যেখানে আঘাত হানতে সাহস পান না অনেক শাসকই। ধর্মের নামে নানা কুসংস্কার তারা মুখ বুঁজে সয়ে যান, কিন্তু মানুষের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার ঝুঁকি নিতে কিছুতেই রাজি হন না।

সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর চরিত্রে কোন অস্পষ্টতা ও আপোষকামীতা ছিল না। ফলে ইসলামের নামে মুসলিম সমাজে যে ধর্মীয় ফেতনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল সেখানে দ্বিধাহীন চিত্তে আঘাত হানলেন তিনি।

সুলতান আইয়ুবীর উপদেষ্টারা অত্যন্ত খালেছ দীলে সুলতানকে এ পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'ধর্ম একটি নাজুক ও সেনসেটিভ ব্যাপার। আপনি কোন মসজিদের ইমামের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলে তার মুসল্লিরা ক্ষেপে যাবে আপনার বিরুদ্ধে। কোন খানকা বা পীরের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিলে ক্ষেপে যাবে তার ভক্ত ও মুরীদরা। ধর্মীয় ব্যাপারে সরাসরি পদক্ষেপ নেয়ার মধ্যে প্রচণ্ড ঝুঁকি আছে।'

সুলতান আইয়ুবী বললেন, 'এদের সংখ্যা কত যারা ধর্মের প্রাণ বলে গণ্য? জনগণ কেন তাদের মুরীদ হয় এ কথা কখনো ভেবে দেখেছেন? তারা মানুষকে ইসলামের দিকে যত

না আহবান করে তার চেয়ে বেশি প্রচেষ্টা চালায় তাকে মুরীদ বানাতে। আমি জানি, এই জাতীয় ইমাম ও পীরেরা তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে গিয়ে লোকদেরকে ধর্মের মূল বিষয় থেকে দূরে রাখে।

মুসলিম জাতির মূল শিক্ষাকেন্দ্র হলো মসজিদ। মসজিদের চার দেয়ালের মাঝে বসে শ্রোতাদের কানে যাই শোনানো হোক, তাই মানুষের অন্তরে বসে যায়। এটা হয় মসজিদের পবিত্রতার গুণে। আল্লাহর ঘরকে যারা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণার কাজে ব্যবহার না করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের কাজে ব্যবহার করে তাদের হাতে আমি মুসলিম জাতিকে তুলে দিতে পারি না। মসজিদের ইমাম হবেন তিনি, যিনি ইসলামের সঠিক শিক্ষা জনগণের সামনে তুলে ধরবেন। কিন্তু জনগণের মধ্যে ভুল আকীদা বিশ্বাস তুলে ধরা ব্যক্তি যত সম্মানিতই হোক, যত বড় পীর, বুজুর্গ ও মুর্শিদ হিসাবে পরিচিতি লাভ করুক, ইসলামের স্বার্থেই তাদের বিরুদ্ধে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে।'

তিনি আরো বললেন, 'যদি আজ মসজিদে সঠিক দ্বীনী চেতনা সম্পন্ন আলেম ও ইমাম না রাখি, তবে কিছুকাল পরে লোকেরা ইমাম ও পীরদেরই পূজা শুরু করে দেবে। একদিন এই মূর্খ আলেম ও আমলবিহীন ইমামরাই ইসলামের ধ্বংসের কারণ হয়ে যাবে।'

সুলতান আইয়ুবী প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেম জয়নুদ্দিন আলী বিন আল ওয়ায়েজকে তাঁর নতুন উপদেষ্টা নিয়োগ করলেন। এই মশহুর আলেম তাঁর ছাত্রদের দিয়ে একটি নিজস্ব গোয়েন্দা নেটওয়ার্ক গড়ে

তুলেছিলেন। তিনি তাঁর ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন। তাঁর ছাত্ররা বড় বড় মাদ্রাসায় শিক্ষক হতেন, নামকরা মসজিদের ইমাম হতেন এবং নিয়মিত তাঁর সাথে যোগাযোগ রাখতেন।

তার গোয়েন্দা বিভাগ একবার খৃস্টানদের একটি বড় ধরনের চক্রান্ত উদঘাটন করে প্রশাসনকে সতর্ক করেছিল। প্রশাসন তদন্ত করে দেখল, ঘটনা সত্য। সাথে সাথে এর সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতার করা হলো। ফলে মুসলমানরা ভয়াবহ এক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেলো।

তিনি ধর্মের নামে সারা দেশে যে সব নিত্য নতুন ফেতনা তৈরী হতো তার খোঁজ রাখতেন এবং নিজের সামর্থ অনুযায়ী তার মোকাবেলা করার চেষ্টা করতেন।

তিনি সুলতান আইয়ুবীকে বললেন, 'যদি এখনই আপনি ধর্মের সর্বনাশকারী এইসব ফেতনার কবল থেকে ইসলামকে মুক্ত না করেন তবে ভবিষ্যতে আপনাকে এর জন্য চরম মূল্য দিতে হবে। তখন আল্লাহর কালামের পরিবর্তে এই সব তথাকথিত ধর্মীয় নেতাদের আদেশকেই জনগণ ইসলামী আইন বলে ধরে নেবে। খৃস্টানরা এরই মধ্যে মুসলমানদের মনে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা ও ব্যক্তিপূজাকে ইসলামের অঙ্গ বানিয়ে ফেলেছে। ফেতনাবাজরা কেউ বুঝে, কেউ না বুঝে, কেউ জেনে, কেউ না জেনে খৃস্টানদের পরিকল্পনাই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। অতএব, এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিতে দ্বিধা বা দেরী করার কোন অবকাশ নেই।'

আল্লামা জয়েনউদ্দিনের পরামর্শের প্রেক্ষিতে সুলতান

আইয়ুবী এক জরুরী ফরমান জারী করলেন। এ ফরমানে তিনি বললেন, 'আল্লামা জয়েনউদ্দিন আলী বিন আল ওয়ায়েজের নেতৃত্বে দেশের হাক্কানী আলেমদের সমন্বয়ে 'ইমাম নিয়োগ বোর্ড' গঠন করা হলো। দেশের সমস্ত মসজিদের ইমামদের ইসলামী জ্ঞান সম্পর্কে এ বোর্ড পরীক্ষা গ্রহণ করবে। এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের আমল আখলাক ও নিজ পরিবারে কি ধরনের ধর্মীয় অবস্থা বিরাজ করছে বোর্ড তা তদন্ত করে দেখবে। তদন্ত কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে এবং সুপারিশক্রমে সারা দেশের সকল মসজিদে ইমাম নতুন করে নিযুক্ত হবে।'

আল্লামা জয়েনউদ্দিন নতুন ইমাম নিযুক্তির ব্যাপারে নিম্নোক্ত শর্ত আরোপ করলেন। যিনি ইমাম হবেন:

১. তিনি অবশ্যই ইসলামী জ্ঞানে পারদর্শী হবেন।
২. তিনি প্রয়োজনীয় সামরিক জ্ঞান ও ট্রেনিং প্রাপ্ত হবেন।
৩. তাঁর আমল স্বচ্ছ, পরিষ্কার ও অনুকরণীয় হতে হবে।
৪. তাঁর পরিবারে ইসলামী আমল আখলাক থাকতে হবে।
৫. তিনি কখনোই খৃস্টানদের মত 'ধর্ম ও জীবন আলাদা' তার মুসল্লিদের এ শিক্ষা দেবেন না। বরং ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এ সত্য তুলে ধরবেন।
৬. প্রতিটি মুমীনের অন্তরে শাহাদাতের তামান্না ও জেহাদী জযবা সৃষ্টির ব্যাপারে সর্বদা সজাগ থাকবেন।

সাদিয়া প্রতিদিন দুই বেলা ইমামের জন্য মসজিদে খাবার নিয়ে আসে। মাহমুদ বিন আহমদও ধর্মীয় শিক্ষা লাভের কথা বলে সেখানেই অবস্থান করতে থাকে। ইমামের সাথে মাহমুদের খাবারও নিয়ে আসে সাদিয়া। অনেক কথা হয় তাদের। সময় পেলেই মাহমুদ চলে যায় সেই চারণভূমিতে, যেখানে সাদিয়া বকরী ও উট চরায়।

জায়গাটা গ্রাম থেকে বেশ একটু দূরে। স্থানটি সবুজ শ্যামলে ভরা। সেখানে পানির ব্যবস্থা আছে, আছে উঁচু নিচু মাটির ঢিবি। সেখানে দিনের একটা উল্লেখযোগ্য সময় কেটে যায় তাদের। মাহমুদ একজন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দার চোখ দিয়ে সাদিয়াকে অনেক পরীক্ষা করেছে, কিন্তু শত্রুদের সাথে তার কোন দূরতম সম্পর্কও আবিষ্কার করতে পারেনি।

এখন তাদের অবস্থা এমন, সাদিয়া মাহমুদকে তার মোহাফেজ মনে করে। সে বিশ্বাস করে, মাহমুদ তাকে কাফেরের হাত থেকে রক্ষা করবে। আর মাহমুদের অবস্থা হচ্ছে, তার ঘাড়ে চেপে আছে দায়িত্বের বোঝা। নইলে যে কোন সময় সাদিয়াকে নিয়ে সে পালিয়ে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু একজন মুজাহিদ রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের চাইতে ব্যক্তিগত সমস্যাকে কখনো বড় করে দেখে না। ফলে সাদিয়াকে নিয়ে তার পালিয়ে যাওয়াও হয়না।

তাছাড়া আরো একটি বিষয় মাহমুদ ভেবে দেখেছে। সাদিয়ার বিষয়টি মসজিদের ইমাম সাহেব জানেন। তিনি উর্ধতন গোয়েন্দা অফিসার এবং এ অঞ্চলের দায়িত্বশীল কর্মকর্তা। তার নির্দেশেই সে এ মসজিদে আছে। সাদিয়ার সমস্যা নিয়ে তিনিও পেরেশান। সাদিয়ার হেফাজত করাকে

তিনি তার ঈমানী ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব হিসাবে নিয়েছেন। অতএব সাদিয়ার কোন বিপদ দেখা দিলে তিনি তার মোকাবেলা অবশ্যই করবেন। ফলে সাদিয়াকে নিয়ে মাহমুদের খুব বেশি দুশ্চিন্তা না করলেও চলবে।

একদিন রাতে সহসা গ্রামে আলোর ছড়াছড়ি দেখা গেল। অন্ধকার ভেদ করে অপূর্ব সব দৃশ্য দেখা যেতে লাগলো গ্রাম জুড়ে। লোকজন ছুটাছুটি করতে লাগলো মশাল হাতে। সবার মাঝে ছড়িয়ে পড়ল অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য। প্রত্যেকের মুখে একই কথা, তিনি আসছেন! আকাশ থেকে নেমে আসছেন জামানার পীর! তিনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন! মানুষের অসুখ সারাতে পারেন! তিনি সব অভাব দূর করতে পারেন! মানুষের মনোবাসনা পূরণ করতে পারেন! তিনি আসছেন!

গ্রামের প্রতিটি মানুষ খুশি। তারা বলাবলি করতে লাগল, 'আমাদের আশা পূরণকারী আসছেন!'

রাতের আঁধারের তোয়াক্কা না করেই সাদিয়া দৌড়ে গেল মসজিদে। মাহমুদকে বললো, 'শুনেছো, তিনি আসছেন! তুমি জানো আমি তার কাছে কি চাইব? আমি তার কাছে আরজ করে বলবো, মাহমুদ যেন শীঘ্রই এখান থেকে আমাকে নিয়ে পালিয়ে যায়।'

মাহমুদ এ কথার কোন উত্তর দিল না। কেন যেন এ পীরের কাছে কিছু চাইতে তার মন সায় দিচ্ছে না। তার বিবেক, বুদ্ধি, শিক্ষা বলছে, এর মাঝে কোথায় যেন একটু ফাঁক আছে। লোকটির আচরণ রহস্যময়, যদিও সবাই তাকে পয়গম্বরের মত ভক্তি করে।

মাহমুদ এ অঞ্চলে আসার পর রহস্যময় পীরের এই প্রথম আগমন। তার কেরামতি ও মোজেজার কাহিনীতে তাই এখন মুখর এ অঞ্চল। মাহমুদ বলল, 'বাড়ি যাও, রাতের আঁধারে মেয়েদের এভাবে একাকী বাইরে বেরোনো ঠিক নয়।'

সাদিয়াকে এগিয়ে দিতে বাইরে বেরিয়ে এল মাহমুদ। তাকিয়ে দেখল, যে প্রান্তরে সাদিয়া বকরী চরায় সেখানে অনেক মশাল। ওখান থেকে ভেসে আসছে লোকজনের শোরগোল ও কোলাহল। সাদিয়াকে তার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে মাহমুদ এগিয়ে গেল সেদিকে।

ওখানে পৌঁছে সে দেখতে পেল অনেক অপরিচিত লোকের ভীড় সেখানে। এই ভীড়ের মধ্যে সে তার দুজন সহকর্মীকেও দেখতে গেল। এ দুজনের ডিউটি এ অঞ্চলে ছিল না, অন্য অঞ্চল থেকে এরা এসেছে। মাহমুদ তাদের জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা এ এলাকায় এসেছো কেন?'

'আমরা পীর সাহেবকে এক নজর দেখতে এসেছি।'

মাহমুদ ওদের সাথে আলাপ করে বুঝলো, গোয়েন্দা হিসেবে নয়, পীরের প্রতি ভক্তিবশত ওরা তাকে দেখতে এসেছে।

তারা পীরের কেরামতির নানা কাহিনী মাহমুদের কাছে বলতে লাগলো। তাদের কথায় মাহমুদ বুঝলো, এরা দু'জনেই রহস্যময় পীরকে সঠিক ও কামেল পীর বলে বিশ্বাস করে। মাহমুদ চিন্তা করতে লাগলো, আলী বিন সুফিয়ানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গোয়েন্দারাও তার ভক্ত হয়ে গেছে! তবে কি তিনি আসলেই কোন কামেল দরবেশ?

পরদিন ভোর। ফজর পড়েই মাহমুদ দ্রুত সে প্রান্তরে গিয়ে হাজির হলো। প্রতিদিন সাদিয়া এ প্রান্তরে বকরী ও উট চরায়। মাহমুদ এসে তার সাথে দেখা করে, গল্প করে সময় কাটায়। কিন্তু আজ এখানে অনেক অপরিচিত লোকের ভীড়। লোকজন ব্যস্তসমস্ত হয়ে চলাফেরা করছে। তাবু খাটানোর সামগ্রী পড়ে আছে এখানে ওখানে। দু'জন লোককে সামনে পেয়ে মাহমুদ জিজ্ঞেস করলো, 'এখানে কি হচ্ছে?'

একজন জবাব দিল, 'পীর সাহেব এখানে থাকবেন, এ জন্য এ জায়গা আমরা পরিষ্কার করছি।'

মাহমুদ দেখলো, একটু দূরে এক টিলার পাশে গর্ত করছে কয়েকজন লোক। মাঠের উঁচু নিচু জায়গা যতটা সম্ভব কেটে সমান করা হচ্ছে। নির্দিষ্ট একটা এলাকায় সীমানা খুটি বসানো হচ্ছে। ওখানে এখন বাইরের কারো যাওয়ার অনুমতি নেই।

গ্রামের লোকেরা কাজকর্ম ফেলে সেখানে জড়ো হয়ে তামাশা দেখতে লাগলো। অচেনা লোকগুলো ঘুরে ঘুরে ওদের কাছে পীর সাহেবের কেরামতির গল্প করতে লাগলো। লোকেরা এইসর্ব গল্প শুনে আনন্দে পুলকিত হচ্ছিল, উত্তেজনার রোমাঞ্চ অনুভব করছিল।

লোকজন ওদের প্রশ্ন করতে লাগল, 'পীর সাহেব কখন আসবেন?'

এ প্রশ্নের জবাবে লোকগুলো বলল, 'তিনি যে কোন সময় চলে আসবেন।'

সন্ধ্যা পর্যন্ত লোকেরা পীর দর্শনের উত্তেজনা নিয়ে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকল। কিন্তু তিনি এলেন না।

পরদিন ভোর হওয়ার সাথে সাথেই লোকেরা আবার সেখানে গিয়ে ভীড় করলো। আগের ঘেরাও করা এলাকার বাইরে বেশ বড়সড় জায়গা নিয়ে আরেকটি ঘেরাও তৈরী করা হয়েছে। লোকজনকে সে ঘেরাও করা সীমানার বাইরেই থামিয়ে দেয়া হলো। উৎসুক জনতা গভীর আগ্রহ নিয়ে ওদের কাজকর্ম দেখতে থাকলো। বিকাল থেকে পীর সাহেবের লোকদের আনাগোনা ও সমাগম বাড়তে লাগল। কিছু কিছু লোক এলো উটের পিঠে চড়ে। সে সব উটের পিঠে মালপত্র বোঝাই করা। তারা উট থেকে নেমে মাল-সামান নামানো শুরু করলো। আরেকদল সেইসব ম - তাবুগুলোতে নিয়ে যেতে থাকলো।

সন্ধ্যা পার হয়ে রাত গভীর হতে লাগলো। মাঝ রাতেরও বেশ পরে আকাশে চাঁদ উঠলো। সেই চাঁদ পশ্চিম দিকে গড়িয়ে যেতে থাকলো। রাতের শেষ প্রহর। ক্ষীণ চাঁদ অনেক পথ অতিক্রম করে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হতে থাকলো। চাঁদের আলো ঘোলাটে হয়ে এল। লোকজন বলাবলি করতে লাগলো, 'এই বার তিনি আসমান থেকে নেমে আসবেন। দেখা দেবেন ভক্তদের।'

তারা এসব বলাবলি করছিল, কারণ পীরের খাদেমরা আজ বলেছে, 'রাতের অন্ধকারে, বিশেষ করে আবছা আলো-আঁধারীতেই তিনি নিজেকে ভক্তদের সামনে হাজির করেন।' কিন্তু আজও তিনি দেখা দিলেন না।

পরদিন দিনভর লোকজন পীরের লোকদের সাথে গল্প করে কাটালো। সন্ধ্যার পর আজ আর কেউ বাড়ি গেল না। তারা গভীর আগ্রহ নিয়ে দেখতে লাগল পীর সাহেবের

লোকদের কাজকর্ম, আর অপেক্ষা করছিল, কখন পীর সাহেব তশরিফ আনবেন!

সারাদিনের কাজের পর গ্রামের মেয়েরা রাতে একটু অবসর পেল। সেই অবসরে দল বেঁধে ওরা গেল সেই তামাশা দেখতে।

মাঠের একদিকে গ্রামের মেয়েরা জটলা করে দাঁড়িয়ে ছিল। অন্ধকারে কেউ কাউকে ঠিকমত দেখতে পাচ্ছিল না। সেই মেয়েদের সাথে মিশে সাদিয়াও দাঁড়িয়েছিল ওখানে। তাকিয়েছিল পীর সাহেবের জন্য ঘেরাও করা জায়গার দিকে। ওখানে অনেকগুলো মশালের আলো জ্বলছে।

ওরা ভাবছিল, গতকাল যখন পীর সাহেব আসেননি, তখন আজ নিশ্চয়ই আসবেন। ওরা পীর দর্শনের গভীর প্রত্যাশা নিয়ে ঘেরাওয়ের বাইরে দাঁড়িয়েই রইল। কিন্তু ওদের কারো জানা ছিলনা, একটু পর কি ঘটনা ঘটবে।

দু'জন অচেনা লোক পিছন থেকে মেয়েদের দিকে এগিয়ে গেলো। দু পাশ থেকে এলো দু'জন করে মোট চারজন। মেয়েরা তাদের আগমন খেয়াল করেনি। ওদের কাছে এসে তারা চাপা কণ্ঠে চিৎকার করে উঠলো, 'এই, তোমরা এখানে কি করছো? সরো, সরে যাও এখান থেকে।'

অন্ধকারে মেয়েরা হুড়োহুড়ি শুরু করল। একজন আগন্তুক ছোট একটা মশাল ধরিয়ে তাড়া করলো মেয়েদের। মেয়েরা ভয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করে এদিক ওদিক পালাতে লাগলো। লোকটার মশালের আলোয় বাকী পাঁচজন মেয়েদের মধ্যে কাউকে খুঁজতে শুরু করলো। হঠাৎ একজন সাদিয়াকে দেখতে পেয়ে আস্তে চিৎকার দিল; 'এই, এদিকে।'

লোকগুলো খোঁজাখুজি বাদ দিয়ে ছুটে এল সেই চিৎকার লক্ষ্য করে। এই হট্টগোলের মধ্যে একজন সাদিয়ার ওপর একটা কম্বল ছুঁড়ে মারল। কালো কম্বলের নীচে ঢাকা পড়ে গেল সাদিয়া। এক লোক দ্রুত কম্বল ঢাকা সাদিয়াকে তার শক্ত বাহু দিয়ে পেঁচিয়ে ধরে অন্য হাতে মুখ চাপা দিয়ে তাকে কাঁধের ওপর উঠিয়ে নিল।

একে তো অন্ধকার, তার ওপর মেয়েরা সবাই পালিয়ে যাওয়ার হুড়োহুড়িতে ব্যস্ত থাকায় কেউ খেয়ালই করল সাদিয়াকে কেউ অপহরণ করছে।

পরদিন সকালে মানুষের ঢল নামলো সেখানে। সেই গ্রাম এবং আশপাশের অন্যান্য গ্রামের লোকেরা চারণভূমির দিকে ছুটে আসতে লাগলো দলে দলে। লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল নির্জন চারণভূমি।

সতেরোটি উট মন্থর পায়ে এগিয়ে আসছে চারণভূমির দিকে। প্রত্যেক উটের পিঠে সুন্দর করে সাজানো পালকি। প্রত্যেক পালকিতে রেশমী কাপড়ের পর্দা ও সোনালী-রূপালী ঝালর লাগানো। এই সতেরো পালকির কোন একটাতে আছেন সেই মশহুর পীর।

মিছিলের অগ্রভাগে শানাই ও ঢোল বাজছে। পীরের খাদেম ও ভক্তকুল উটের সারির আগে পিছে মিছিল করে এগিয়ে চলেছে। ভাবগম্ভীর ভাবে গুণ গুণ করে দোয়া কালাম পড়ছে ওরা। উটগুলোর লম্বা গলায় ঝুলানো ঘণ্টার ধ্বনি ঐকতানে ঝংকৃত হয়ে অপূর্ব সরের লহর তুলছে। ধীর পায়ে এগিয়ে চলেছে উট ও মানুষের বিশাল কাফেলা। কিন্তু কোন

বিশৃংখলা নেই, শোরগোল বা হই হট্টগোল নেই। একটি পবিত্র ভাবগম্ভীর পরিবেশ বিরাজ করছে মিছিলের সর্বত্র।

লোকজন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল এ শানদার মিছিলের দিকে। পীর সাহেবকে কেউ দেখতে পেলো না, তবে তার খাদেমবৃন্দ এবং একান্ত বিশ্বস্ত ভক্ত ও অনুরক্ত মুরিদদের দেখেই অভিভূত হয়ে গেল সবাই।

মিছিলকারীদের পরণে ঢিলেঢালা শাদা আলখেল্লা। তাদের ভাবভঙ্গিতে মনে হচ্ছিল, এরা এই ধুলির ধরণীর কেউ নয়।

কাফেলা সেই সবুজ প্রান্তরে চলে এল। সেখানে টিলার ফাঁকে ফাঁকে অনেক সমান্তরাল ভূমি। তারই একটি সমান্তরাল স্থানে তাবু টানিয়ে পীরের জন্য থাকার আলাদা ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে তার চারপাশে বসে গেল গ্রাম্য মেলা।

উটের আরোহীরা তাবুগুলোর কাছে গিয়ে থামলো। লোকজন ঘেরাও করা সীমানার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল তাদের। শাদা চাদরের ঘেরাও দিয়ে আরোহীদের পালকি থেকে নামানো হলো। ফলে, কে কে নামলো এবং কে কোন তাবুতে আশ্রয় নিল জনগণ তা দেখতে পেল না।

উটের বহরের সাথে হেঁটে আসা মুরিদরা সীমানার বাইরে বসে পড়লো। গ্রামের লোকেরা মুরিদদের কাছ থেকে পীরের কেরামতি ও মোজেজার গল্প শুনতে ঘিরে ধরল ওদের।

রহস্যময় বিষয়ে মানুষের যে সহজাত কৌতুহল থাকে সে কৌতুহলে আন্দোলিত উপস্থিত লোকজন। পীর সাহেব ও

তার সঙ্গী সাথীরা মানুষের এই সহজাত প্রবণতাকে কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে অতিশয় পারঙ্গম। ফলে এক ধরনের রহস্যময়তা কাজ করছিল সেখানে।

ইমাম সাহেব জনতার ভীড়ের মাঝে মিশে গিয়ে সেখানে অবস্থান করছিলেন। গভীর মনযোগ দিয়ে তিনি লক্ষ্য করছিলেন জনগণের মতিগতি। তাঁর সাথে ছিল মাহমুদও। মাহমুদের বিশ্বাসের ভীতে এক ধরনের টানাপোড়েন চলছিল, তাই সে পীর সাহেবের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কোন মন্তব্য করলো না।

সে কায়রো থেকে নির্দেশ পেয়েছে, 'সীমান্ত এলাকায় মানুষের মাঝে যে নতুন বিশ্বাস ছড়ানো হচ্ছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট পাঠাও। সেখানে কি হচ্ছে জানার জন্য কেন্দ্র উদগ্রীব। কারা এগুলো করছে এবং কিভাবে করছে বিস্তারিত জানাবে। কায়রোতে এখনও এ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ কোন রিপোর্ট আসেনি।'

কায়রোতে কেন এখনো কোন রিপোর্ট যায়নি মাহমুদ তা জানে। পীর সাহেবের রহস্যময় তৎপরতায় সাধারণ লোকের মত এখানকার গোয়েন্দারাও অভিভুত হয়ে অনেকেই তার ভক্ত হয়ে গেছে। যারা ভক্ত হয়নি তারাও ভয়ে পীরের বিরুদ্ধে কোন রিপোর্ট দিতে সাহস পায়নি। এ জন্যই সীমান্ত থেকে পীরদের তৎপরতা সম্পর্কে কেন্দ্র আজো সঠিক রিপোর্ট পায়নি।

এখন এর পুরো দায়িত্ব চাপলো ইমাম সাহেবের ওপর। এ জন্যই তিনি মাহমুদকে নিয়ে এখানে এসেছেন। তাঁর বিশ্বাস, পীর সাহেব যাদু বা ভিলকিবাজি করে মানুষকে

বিভ্রান্ত করছে।

ইমাম সাহেব দেখলেন, অধিকাংশ লোক মুরিদদের মুখে পীরের প্রশংসা শুনেই তার বশীভূত হয়ে যাচ্ছে।

তারা পীরের কেরামতি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগল। কেউ ওখান থেকে সরতে নারাজ, পাছে কেরামতি দেখার সৌভাগ্য থেকে যদি বঞ্চিত হতে হয়!

সাদিয়ার অপহরণের খবর এখনো জানেন না ইমাম সাহেব ও মাহমুদ। হঠাৎ সাদিয়ার বাবা তাদের দেখতে পেয়ে ছুটে এল সেখানে। সাদিয়ার বাপের বিপন্ন ও বিপর্যস্ত অবস্থা দেখে অজানা আশংকায় কেঁপে উঠল মাহমুদের হৃদয়। ইমাম সাহেব ত্রস্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে তোমার?' তার কণ্ঠে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা।

সাদিয়ার পিতা ম্লান চোখে তাদের দিকে চাইল। সে চোখে বেদনার অথৈ সাগর। বললো, 'সাদিয়া গত রাতে বাড়ী ফেরেনি। গ্রামের মেয়েরা বললো, রাতে সাদিয়া তাদের সাথে এখানেই ছিল। হঠাৎ চার, পাঁচ জন লোক এসে তাদের তাড়া করে। সবাই হুলুস্থুল করে পালিয়ে যায়, কিন্তু তারপরে আর সাদিয়ার সাথে তাদের দেখা হয়নি। তার কি হয়েছে তারা কেউ জানে না।'

সকাল থেকেই সাদিয়ার পিতা পাগলের মত মেয়েকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। আশপাশের বাড়িতে খোঁজ নেয়ার পর মেয়েকে না পেয়ে ছুটে গিয়েছিলেন মসজিদে। ওখানে ইমাম সাহেব বা মাহমুদ কাউকে না পেয়ে ছুটে এসেছেন এখানে।

হঠাৎ করে এ দুঃসংবাদ শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন ইমাম

সাহেব। মেয়ে হারানোর বেদনায় শোকার্ত পিতাকে কি বলে শান্তনা দেবেন ভেবে পেলেন না। মাহমুদও চুপচাপ। কিছু একটা বলার জন্য মুখ খুলতে যাচ্ছিলেন ইমাম সাহেব, তার আগেই মেয়ের খোঁজে ভীড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল সাদিয়ার পিতা।

সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদ পিছু নিল তার। দু'জনেই ভীড়ের মধ্যে সাদিয়াকে খুঁজতে লাগলো। কিন্তু এই ভীড়ের মধ্যে সাদিয়া থাকলে তো তাকে খুঁজে পাবে তারা! পুরো এলাকা তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, কিন্তু সাদিয়াকে কোথায় পাওয়া গেল না। তবুও বাপের মন বুঝ মানে না, সে এদিক ওদিক ঘুরতেই থাকে। তার পিছু পিছু ঘুরতে থাকে মাহমুদও।

তাদেরকে এখানে ওখানে উঁকিঝুঁকি মারতে দেখে এক অচেনা লোক এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমরা কি কাউকে খুঁজছো?'

'গত রাত থেকে আমার মেয়ের খোঁজ পাচ্ছি না। গাঁয়ের মেয়েদের সাথে এখানেই ছিল সে কাল রাতে। কিন্তু সবাই বাড়ি ফিরলেও সে বাড়ি যায়নি।'

'অ, তুমিই মেয়েটির বাবা!' লোকটি সাদিয়ার বাপকে বললো, 'মনে হয় তুমি তোমার মেয়েকে এখানে খুঁজে পাবে না। এখন হয়তো তারা মিশরের সীমানা পার হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে।'

'কি বলছো তুমি? আমার মেয়ে কেন মিশর ছেড়ে যাবে?'

'তার আমি কি জানি!' লোকটি নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'গতকাল সন্ধ্যায় আমি এক ঘোড়সওয়ারকে দেখলাম

মেয়েদের দিকে এগিয়ে যেতে। তার চলাফেরায় কেমন একটা সতর্ক ভাব। লোকটার আচরণে সন্দেহ হওয়ায় আমার কৌতূহল হলো। দেখলাম, ঘোড়সওয়ার মেয়েদের জটলা থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগল।

একটু পরে মেয়েদের জটলা থেকে এক যুবতী বেরিয়ে এসে ঘোড়সওয়ারের পাশে দাঁড়ালো। ওরা নিচু স্বরে কি কথা বলেছে আমি শুনতে পাইনি। এরপর দেখলাম, মেয়েটি এদিক ওদিক তাকিয়ে নিজেই আরোহীর সামনে উঠে বসলো। তারপর আরোহী ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল ওখান থেকে। আমি দেখছিলাম আর চিন্তা করছিলাম, আল্লাহ জানে এ মেয়েটি কার! নিশ্চয়ই সে বাপ-মাকে ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে।'

লোকটির কথা শুনে পাশে দাঁড়ানো একজন বলে উঠলো, 'তুমি কেমন বাপ হে! নিজের মেয়ে কার সাথে প্রেম করে বেড়ায় খবর রাখো না? এখন বসে বসে কপাল চাপড়াও, অযথা আর তাকে খোঁজার বৃথা চেষ্টা করো না।'

লোকটি চলে গেল। সাদিয়ার বাবার চোখে নেমে এল অশ্রুর ধারা। কিন্তু মাহমুদের প্রতিক্রিয়া হলো অন্য রকম। কারণ সে ছিল গোয়েন্দা। সে চিন্তা করে দেখলো, এ লোক যা বলেছে তা ডাহা মিথ্যা ছাড়া আর কিছু নয়। তার বর্ণনায় একবিন্দু সত্য থাকতে পারে না। কেমন করে সে বলতে পারল, সাদিয়া এক ঘোড়সওয়ারের সাথে পালিয়ে গেছে! এত ভীড়ের মধ্যে সে একাই এ ঘটনা দেখতে পেলো আর কেউ কিছু টের পেল না! অসম্ভব, এ হতেই পারে না।

কারো কথা যাচাই বাছাই না করে চট করে বিশ্বাস করা গোয়েন্দাদের প্রশিক্ষণের পরিপন্থী। গোয়েন্দা ট্রেনিংয়ের মূল

কথা হলো, কারো কথা চট করে বিশ্বাসও করবে না, অবিশ্বাসও করবে না। আগে খতিয়ে দেখবে যুক্তি বুদ্ধি দিয়ে। সম্ভব হলে সরেজমিনে তদন্ত করবে। তারপর নিরূপণ করবে তার কথা সত্য না মিথ্যা। গোয়েন্দাদের সন্দেহপ্রবণতা ও বিশ্বাসের বিশেষ মানদণ্ড আছে, সবকিছুই তারা সেই চোখ দিয়ে দেখে। মাহমুদ ঐ অচেনা লোকটির পিছনে লেগে গেল।

লোকটি হাঁটতে হাঁটতে ভীড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে টিলার দিকে এগিয়ে গেল। মাহমুদ দূর থেকে ফলো করে এগিয়ে গেল সেই টিলার দিকে। টিলার পেছনে পীর সাহেব ও তার খাদেমদের তাবুর সারি। মাহমুদ টিলায় চড়ে লোকটাকে আর দেখতে পেল না। নিশ্চয়ই টিলা থেকে নেমে সে এই তাবুর সারির কোন একটিতে ঢুকে পড়েছে।

লোকটা তাবুর সারির মাঝে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ায় মাহমুদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো, সাদিয়া এখানেই কোন তাবুতে আছে। তাকে অপহরণ করার পেছনেও এ লোক জড়িত।

লোকটা সাদিয়ার খরিদ্দারের কেউ নয় তো? সাদিয়ার বাবাকে হুমকি দিয়ে রাজি করিয়েছিল ওরা। হঠাৎ অপহরণের সুযোগ পেয়ে টাকা খরচের হাত থেকে বাঁচার জন্য এ কাজ করেনি তো ওরা!

চিন্তাটা মাহমুদের মাথায় ঘুরপাক খেতে থাকল, টিলা থেকে নেমে এল মাহমুদ। দেখা যাচ্ছে, সাদিয়ার বাবা লোকটিকে না চিনলেও তারা তাকে ভাল করেই চেনে। মাহমুদ নিশ্চিন্ত, সাদিয়ার বাবাকে মিথ্যা বলে বিভ্রান্ত করার জন্যই লোকটি এই কাহিনী বানিয়েছে, যেন তিনি তার

মেয়েকে এখানে আর খুঁজে না বেড়ান।

মাহমুদ বিন আহমদের মনে সাদিয়ার জন্য ছিল গভীর ভালবাসা। সাদিয়াও তাকে ভালবাসে, আর ভালবাসে বলেই এখান থেকে তাকে নিয়ে সরে পড়তে চেয়েছিল। সে ভালবাসার পরীক্ষায় পড়ল মাহমুদ। এ পরীক্ষায় তাকে যে উত্তীর্ণ হতেই হবে!

মাহমুদ ইমাম সাহেবকে খুঁজে বের করে তাকে তার সন্দেহের কথা বললো। ইমাম সাহেব একজন বিচক্ষণ গোয়েন্দা কমাণ্ডার। তিনি মাহমুদের সাথে এক মত হয়ে বললেন, 'ঠিকই ধরেছো তুমি, সাদিয়ার বাবাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই তার মেয়ে অন্য কারো সাথে পালিয়ে গেছে বলে প্রচারণা চালানো হয়েছে।'

মাহমুদ বললো, 'তাহলে তাকে উদ্ধার করার জন্য আমাদের এখনি কিছু করা দরকার।'

'হ্যাঁ, তুমি এক কাজ করো, ভীড়ের মধ্যে আমাদের আরো যে দুজন সহকারী আছে তাদের খুঁজে বের করো। ওদের সাথে আলাপ করেই তাকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেবো আমরা।'

মাহমুদ ওদের খুঁজে বের করলো। তারপর জটলা থেকে দূরে এক টিলার আড়ালে ওরা পরামর্শ সভায় বসলো।

মাহমুদ সব খুলে বললো ওদের। সবাই সাদিয়াকে উদ্ধার করার ব্যাপারে একমত হলো। কিন্তু কাজটি এত সহজ ছিল না। পীরের আস্তানা এবং তার লাগোয়া তাবুগুলোর কাছে কারো যাওয়ার অনুমতি ছিল না। এমনকি পীরের খাস মুরিদরা ছাড়া আশপাশের টিলা মাড়িয়ে সেই সমতল ভূমিতে

নামারও অনুমতি ছিল না কারো। পীরের মুরিদরা চারদিক থেকে এলাকাটা ঘিরে রেখেছিল। চাইলেই তাদের অনুমতি পাওয়া যাবে এমন নয়, আবার তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে সেখানে প্রবেশ করাও ছিল দুঃসাধ্য ব্যাপার।

নূরুদ্দিন জঙ্গী ক্রাক অবরোধে সৈন্যদের লাগিয়ে দিয়ে দুর্গ ভাঙ্গার কৌশল চিন্তা করছিলেন। যুদ্ধের অবস্থা জটিল। প্রথম দিনই তিনি বুঝেছিলেন, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী যে দুর্গের পতন ঘটাতে পারেননি তার পতন ঘটানো কোন সহজ ব্যাপার নয়। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারে, কিন্তু সে ক্রাকের পতন ঘটাতে পারেনি। এতেই এ যুদ্ধের গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর ভরসা সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর দেয়া কিছু তথ্য। তিনি তাঁর সালারদের বললেন, 'এ দুর্গের পতন ঘটানোর সম্ভাব্য কৌশল সে-ই আমাকে বলে গেছে। সে আমাকে বলেছে, এ দুর্গের অভ্যন্তরে কোথায় কি আছে এবং আমরা কি ধরনের প্রতিরোধের সম্মুখীন হবো। কোথায় রসদ আছে, কোথায় যুদ্ধের বাহন ঘোড়া আর উট, কোথায় সেনাবাহিনীর ব্যারাক, সব সে বলেছে আমাকে। শহরের খৃস্টান প্রধান আবাসিক এলাকা এবং মুসলিম প্রধান আবাসিক এলাকাও সে আমাকে চিনিয়ে দিয়ে গেছে। তার জানবাজ গোয়েন্দারা এসব তথ্য খুব নিখুঁত ও যত্ন সহকারে সংগ্রহ করেছে বলেই আমার বিশ্বাস। আমাদের অভিযানে এ সব তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম।'

তিনি দুর্গের মধ্যে অগ্নি বর্ষণ করার কথা চিন্তা

করছিলেন। কিন্তু তার মেনজানিক ছিল ছোট এবং কম শক্তিসম্পন্ন। ক্রুসেডদের ছিল ভারী মেনজানিক। এর সাহায্যে ওরা বহু দূর পর্যন্ত অগ্নিগোলা ছুঁড়ে মারতে পারতো। সুলতান নুরুদ্দিন জঙ্গীর মেনজানিকের ক্ষমতা কম বলে এ চিন্তা তিনি মাথা থেকে বিদায় করলেন।

আইয়ুবীর মুজাহিদরা যেখান দিয়ে দেয়াল ভাঙ্গার চেষ্টা করেছিল আর ক্রুসেডাররা দেয়ালের ওপর থেকে ড্রামের আড়াল নিয়ে জ্বলন্ত কাঠ নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে মেরেছিল মুজাহিদদের, জঙ্গী অনেকক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তাবুতে ফিরে এসে তিনি তাঁর সহকারী সেনাপতি ও কমাণ্ডারদের ডাকলেন।

সবাই এসে পৌঁছলে তিনি বললেন, 'যত কঠিনই হোক, দুর্গ আমাদের দখল করতেই হবে। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বলে গেছে, শক্তিশালী ও বড় ধরনের মেনজানিক ব্যবহার করতে পারলে সুফল পাওয়া যেতে পারে। আমি তার সাথে একমত, কিন্তু তাতে ভেতরের মুসলমানদের ক্ষতি হওয়ার আশংকা আছে। এতে একজন সাধারণ মুসলমান মারা গেলেও তা হবে আত্মঘাতি অপারেশন। সারা জীবন এ জন্য আমাকে অনুতপ্ত থাকতে হবে।'

একজন অফিসার বললেন, 'অবস্থার আলোকে আমি মনে করি আইয়ুবীর চিন্তা ও পরিকল্পনা আবার নতুন করে খতিয়ে দেখা দরকার। আমি ইচ্ছে করলে বড় ও শক্তিশালী মেনজানিক বানানোর ব্যবস্থা করতে পারি।'

'কিন্তু তাতে মুসলমানদের ক্ষতির আশংকা থেকেই যায়।' বললেন আরেক অফিসার।

জঙ্গী বললেন, 'বন্ধুরা আমার! যদি তোমরা ভিতরের মুসলমানদের অবস্থা জানতে, তবে বলতে, বেঁচে থাকার চেয়ে তাদের জন্য এখন মরণও ভাল। কারণ, সেখানকার কোন মুসলমানেরই জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু এখন আর নিরাপদ নেই। মুসলমান নারী ও শিশুরা খৃস্টানদের করুণার শিকার। আর যুবক ও পুরুষেরা তাদের জেলখানায় পড়ে থেকে বেগার খাটছে। তারা আল্লাহর কাছে মিনতি করে বলছে, 'আল্লাহ, হয় আমাদের মুক্ত করো না হয় মৃত্যু দাও।'

'মাননীয় সুলতান!' একজন কমাণ্ডার আবেগদীপ্ত কণ্ঠে বলল, 'আমাদের অবরোধ যত দীর্ঘ হবে ততই তাদের দুঃখ দুর্দশা বাড়বে। আমরা যদি অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করি তবে সব মুসলমান পুড়ে যাবে এমন নয়। যদি কেউ মারা যায় তবে মনে করবো তারা আমাদেরই মত জাতির জন্য নিজেদের জীবন কুরবান করে শাহাদাতের গৌরবে ধন্য হয়েছে। আমরা কেন এই রণাঙ্গণে মরতে এসেছি? এসেছি এ জন্য যে, ইসলামকে জিন্দা রাখতে হলে কিছু জীবন সব সময় কুরবানীর জন্য প্রস্তুত রাখতে হয়। আমি আপনাদের সামনে এই পরামর্শ রাখতে চাই, দুর্গ অধিকারের জন্য কিছু নিরপরাধ মুসলমানের জীবনের ঝুঁকি নিতে হলে আমাদের তাও নেয়া উচিত।'

'আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যিনি জাতির বৃহত্তর স্বার্থের কথা চিন্তা করেন না।' এক সেনাপতি বললো, 'আমরা এখানে এসেছি এখানকার মুসলমানদেরকে জালিমের হাত থেকে রক্ষা করতে। এই ফিলিস্তিন মুসলমানদের আবাসভূমি। এখানেই আমাদের প্রথম কেবলা অবস্থিত। আজ

সে কেবলা দুশমনের কব্জায়। আমরা এখানে আবার দ্বীনের পতাকা উড়াতে চাই। আমাদের প্রথম কেবলাকে খৃস্টান ও ইহুদীদের কবল থেকে মুক্ত করতে চাই। কয়েকটি প্রাণের বিনিময়ে আপনি যদি জাতির এ স্বপ্ন সফল করতে পারেন জাতি চিরদিন কৃতজ্ঞতার সাথে আপনার কথা স্মরণ করবে এবং আপনার জন্য দোয়া করবে।'

'ফিলিস্তিন ইহুদীদের জন্মভূমি, এ দাবী কখনও বরদাশত করার মত নয়।' অন্য একজন বললেন, 'আমরা সবাই তাদের এ দাবী মিথ্যা প্রমাণ করতে জীবন বাজি রেখেছি, প্রয়োজনে আমাদের সন্তানদেরও কুরবানী দিতে প্রস্তুত আছি।'

নূরুদ্দিন জঙ্গীর মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠলো, সে হাসি আনন্দের না বেদনার ঠিক বুঝা গেল না। তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের এ আবেগ ও চেতনাকে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু যুদ্ধে জিততে হলে তোমাদের জানতে হবে দুশমনের শক্তি, ক্ষমতা ও যুদ্ধের কৌশল। তারা ফিলিস্তিনে তাদের আধিপত্য কায়েম করার জন্য তাদের সমগ্র শক্তি ও ক্ষমতা নিয়োজিত করেছে। এ জন্য তারা তাদের সব সম্পদ এবং এমনকি তাদের যুবতী মেয়েদের সম্ভ্রম পর্যন্ত বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। তারা কেবল অস্ত্র দিয়েই যুদ্ধ করছে না, তাদের সম্পদ এবং কোমলমতি মেয়েদেরও ব্যবহার করছে আমাদের বিরুদ্ধে।

তারা এই ধন সম্পদ ও মেয়েদের দিয়ে আমাদের দলের মধ্যে গাদ্দার সৃষ্টি করছে। তাদের সবচেয়ে বড় টার্গেট সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও মিশর। মিশরের বড় বড় শহরে এই সব নির্লজ্জ মেয়েদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। বড়ই অনুতাপের বিষয়, মুসলিম নেতৃবৃন্দ, শাসকবর্গ ও ধনী বণিকেরা ইহুদী-

খৃস্টানদের এই জালে আটকে পড়েছে। তারা আমাদের মধ্যে বিভেদ ও মতপার্থক্য সৃষ্টি করছে। এর পরিণতি কত ভয়াবহ তা ভাবলেও আমার গা শিউরে উঠে। তারা এমন একটি দিনের আশায় কাজ করছে, যখন তাদের আর আমাদের সাথে যুদ্ধ করতে হবে না, বরং আমরাই ভাইয়ে ভাইয়ে যুদ্ধ করে পরষ্পর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবো। অত্যন্ত সুকৌশলে এবং সুক্ষ্মভাবে এ কাজ করছে তারা। আফসোস, আমাদের জাতির কর্ণধার ও প্রভাবশালী লোকজন এ ব্যাপারে উদাসীন। এ উদাসীনতা না কাটলে এ জাতির ধ্বংস ও বরবাদী কেউ ঠেকাতে পারবে না।

যদি আমরা এখনও সজাগ না হই তবে ইহুদীরা একদিন ফিলিস্তিনের মাটি থেকে মুসলমানদেরকে উচ্ছেদ করবে। তাদের ভিটেমাটি থেকে তাড়িয়ে দেবে, ভেড়ার পালের মত হাঁকিয়ে নিয়ে তুলবে উদ্বাস্তু শিবিরে। আর ফিলিস্তিনকে বানিয়ে নেবে নিজেদের মাতৃভূমি। আমাদের প্রথম কেবলা 'আল আকসা'কে তাদের আস্তাবল বানাবে।

মুসলিম দেশগুলো নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করতে থাকবে। অথচ এ কথা কেউ ভাববে না, এই যুদ্ধের পিছনে রয়েছে ইহুদী ও খৃস্টানদের গোপন চক্রান্ত।

অর্থ, নারী ও শরাব দিয়ে ওরা যুদ্ধে বিজয়ী হতে চায়। আমাদের ভবিষ্যত বংশধরদের আলোকিত জীবন নিশ্চিত করতে হলে আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে এ লড়াইয়ে জিততেই হবে।

আমি চাই, আকাশে যখন নতুন মাসের চাঁদ উঠবে তখন যেন সে ক্রাকের দুর্গে আর খৃস্টানের পতাকা দেখতে না পায়।

তার আগেই আমি ক্রাক অধিকার করতে চাই। আমাদের এ অগ্রযাত্রায় যদি দুর্গের পাঁচিল বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় সে পাঁচিল আমরা গুড়িয়ে দেবো। যদি আমাদের পথ রোধ করে দাঁড়ায় খৃস্টান ফৌজ, আমরা লাশের স্তুপ মাড়িয়ে কেল্লায় ইসলামের বিজয় নিশান উড়াবো। খৃস্টানরা কবে আমাদের জন্য দুর্গের ফটক খুলে দেবে সে জন্য আমরা আর অপেক্ষা করবো না। প্রয়োজনে ক্রুসেডদের লাশগুলো আমরা ভূমধ্যসাগরে ডুবিয়ে দিয়ে এই মাটিকে পবিত্র করবো। এরপর আমরা নজর দেবো গাদ্দারদের দিকে। আমরা বেঁচে থাকতে ইসলামের পতাকা আমরা গাদ্দার ও খৃস্টানদের হাতে ভূলুণ্ঠিত হতে দেবো না।'

সুলতান নূরুদ্দিনের সেনাবাহিনীতে ছিল কুশলী অস্ত্র কারিগর। তিনি তাদের হুকুম করলেন, 'খেজুরের বড় বড় বৃক্ষ কেটে মেনজানিক তৈরী করো।'

কারিগররা রাতদিন পরিশ্রম করে মেনজানিক তৈরীতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। সৈনিকরা সেই সব মেনজানিক দিয়ে ছুঁড়ে মারার জন্য ভারী ও বড় বড় পাথর জমা করতে লাগল। তাদের কাছে ছিল সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর রেখে যাওয়া বারুদের স্তুপ। সৈনিকরা সেই বারুদ দিয়ে গোলা তৈরী করতে লাগল।

ইতিমধ্যে মিশর থেকে সুলতান আইয়ুবীর পাঠানো সেনাবাহিনী এসে রিপোর্ট করল নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে। এই সৈন্যদের সম্পর্কেই বলা হয়েছিল, এরা সেনা বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। কিন্তু সুলতান জঙ্গী এদের মধ্যে বিদ্রোহের কোন আলামত দেখতে পেলেন না। বরং তিনি দেখতে

পেলেন তাদের চোখে মুখে জেহাদের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ।

সুলতান জঙ্গীও সুলতান আইয়ুবীর মত দুরদর্শী ও বিচক্ষণ সেনানায়ক ছিলেন। তিনি সৈন্যদের সামনে আরো আবেগময় বক্তব্য দিয়ে তাদের সে আগুনকে আরো উস্কে দিলেন।

সূর্য অস্ত গিয়ে রাত নেমেছে ক্রাকের দুর্গে। ক্রুসেড বাহিনীর সেনানায়করা দুর্গের মধ্যে এক গোপন সম্মেলনে বসেছে। তাদের মধ্যে উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠার কোন ছাপ নেই। খোশ মেজাজে কথা বলছে সবাই। বুঝা যাচ্ছে, এ অবরোধে তাদের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। তাদের এ খুশির কারণ, তারা খবর পেয়েছে, সুলতান আইয়ুবী ময়দান ছেড়ে মিশরে চলে গেছে। শুধু সে একাই যায়নি, সেই সাথে তার পুরো বাহিনীও সে মিশর ফেরত নিয়ে গেছে। তাঁর বদলে এখন অবরোধে নেতৃত্ব দিচ্ছে সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী এবং তার বাহিনীই এখন লড়াই চালাচ্ছে।

আইয়ুবী চলে যাওয়ায় স্বস্তি ও আনন্দ ফিরে আসে দুর্গের অভ্যন্তরে। আইয়ুবী বিদায় নেয়ার পরপরই ক্রুসেড নেতাদের কানে এ সংবাদ পৌঁছে। দু'তিন দিন পর তাদের কাছে খবর পৌঁছে, মিশর থেকে একদল নতুন সৈন্য এসেছে। যদিও এখনো তারা ময়দানে নামেনি তবু এই নতুন সৈন্যের আগমনে পরিস্থিতির কোন রকম হেরফের হয় কিনা দেখার বিষয়। এ ব্যাপারে আলোচনার জন্যই এ সভা ডাকা হয়েছে।

সবেমাত্র আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে, হঠাৎ বিস্ফোরণের বিকট শব্দে কেঁপে উঠলো হলঘর। কোথাও

বাড়ীঘর ধ্বসে পড়ার মত আওয়াজ হলো। বাইরে থেকে ভেসে এলো শোরগোল।

ক্রুসেড কমাণ্ডাররা সকলেই দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে এল। তারা অবাক হয়ে দেখল, লোকজন ছুটাছুটি করে সকলেই শহরের ভেতরের দিকে যাচ্ছে। তারা পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেল। পাঁচিল থেকে বেশ খানিকটা দূরে এক বাড়ির ছাদ ফেটে গেছে। পাঁচিল টপকে একটি ভারী পাথর এসে আঘাত করেছে সে ছাদে। অবশ্য ঘরের দেয়ালে কোন ফাটল ধরেনি।

খৃস্টান সেনাপতি ও সালাররা ঘটনাস্থলে পৌঁছে জটলা করে ক্ষয়ক্ষতি দেখছিল, অকস্মাৎ তাদের একদম কাছে এসে বিস্ফোরিত হলো আর একটি বড় পাথর। পড়িমরি করে সেখান থেকে পালিয়ে গেল খৃস্টান কমাণ্ডাররা। তারা বুঝতে পারলো, মুসলমানরা বড় ধরনের মেনজানিক দিয়ে পাথর বর্ষণ করছে। তারা নিজ নিজ বাহিনীর কাছে গেল এবং সৈন্যদের নিয়ে দুর্গের প্রাচীরে গিয়ে উঠল। পরিস্থিতি বুঝার জন্য তারা বাইরের দিকে তাকাল, কিন্তু রাতের অন্ধকারে তারা তেমন কিছুই দেখতে পেল না।

এটা ছিল সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীর তৈরী বড় ধরনের মেনজানিকের পরীক্ষামূলক ব্যবহার। এটা চালানো খুবই কঠিন, তবে দূর পাল্লার অস্ত্র হিসাবে এর জুড়ি মেলা ভার। এই মেনজানিক চালাতে প্রচুর শক্তির দরকার হতো বলে মানুষের পরিবর্তে এতে ব্যবহার করা হতো আটটি ঘোড়া। সমস্যা হতো দড়ি কেটে গেলে। তখন দড়ি আবার গিরা দিয়ে বাঁধতে বা নতুন দড়ি লাগাতে হতো। দ্বিতীয় অসুবিধা হতো, আটটি ঘোড়ার প্রচণ্ড টানে দড়ি ছিঁড়ে গেলে ঘোড়াগুলি হুমড়ি

খেয়ে পড়তো। এতে ঘোড়াগুলো পায়ে এমন আঘাত পেতো যে তা আর যুদ্ধের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হতো না। ঘোড়ার সওয়াররাও আঘাত পেতো।

সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী মধ্য রাত পর্যন্ত এই মেনজানিক নিক্ষেপ অব্যাহত রাখলেন। এতে খৃস্টানদের হেডকোয়ার্টারের দুটি ছাদ ভেঙ্গে গেল এবং বেশ কয়েকটি ঘরের দেয়াল ফুটো হয়ে গেল।

এই ক্ষতি তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও এতে ক্রুসেডদের সাহস ও মনোবলে যে ফাটল ধরলো তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দেখা দিল। হেডকোয়ার্টারের দেয়াল ছিদ্র হওয়ায় সেখানকার রক্ষীরা ভয়ে ডিউটি ফেলে পালিয়ে গেলো। সেনা ব্যারাক এবং সমস্ত শহরে বোমা আতংক ছড়িয়ে পড়লো। মধ্যরাতে বোমা নিক্ষেপ বন্ধ হলেও বোমাতঙ্ক বন্ধ হলো না, বরং তা বেড়েই চললো।

মধ্যরাত পর্যন্ত মেনজানিক চালানোর পর হঠাৎ করে তা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণ ছিল মেনজানিক অকেজো হয়ে যাওয়া। পাথর নিক্ষেপের প্রবল চাপ সইতে না পেরে তার একটি অংশ ভেঙ্গে গিয়েছিল। ফলে পাথর দুর্গের মধ্যে পড়ার পরিবর্তে দুর্গের বাইরে পড়তে শুরু করলে সুলতান জঙ্গী পাথর নিক্ষেপ বন্ধ করে দেন।

কিন্তু এ পরীক্ষা ব্যর্থ হয়নি। কুশলী কারিগররা এর প্রধান প্রধান ত্রুটিগুলো সনাক্ত করে একে ত্রুটিমুক্ত করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। তারা গবেষণা করতে লাগল, কি করে দড়ি কাটা ছাড়াই পাথর নিক্ষেপ করা যায়।

নূরুদ্দিন জঙ্গী তাদের বললেন, 'তোমরা যাই করো আর

সময় নষ্ট না করে জলদি করো।'

তারা কাজ আরম্ভ করে দিল।

যারা তীর ধনুক বানাতে পারদর্শী নূরুদ্দিন জঙ্গী তাদেরকে বললেন, 'তোমরা দূরে নিক্ষেপযোগ্য ধনুক তৈরী করো।'

তিনি কমাণ্ডারদের বললেন, 'তোমরা তোমাদের গায়ে গতরে শক্ত পোক্ত জওয়ানদের বাছাই করে পৃথক করো, যারা বিরাট ধনুক দিয়ে তীর নিক্ষেপ করতে পারবে।'

সাদিয়ার গ্রামের বাইরে যেখানে সে বকরী ও উট চরাতো আর মাহমুদ বিন আহমদের সঙ্গে গল্প করে সময় কাটাতো, সেই নির্জন প্রান্তর এখন একেবারে অন্য রকম। সারাটা সময় লোকজনে গমগম করছে। রাতে এমন রহস্যময় আলো-আঁধারীর খেলা শুরু হয় যা দেখে সেখানকার বাসিন্দারা হতবাক হয়ে যায়। তাদের মনে হয়, এসব কিছু এই মাটির পৃথিবীর নয়, সব আকাশ থেকে অবতীর্ণ হচ্ছে।

দিন কেটে রাত এল। অমানিশার ঘোর অন্ধকার ভরা রাত। অন্ধকার ভাল করে জেঁকে বসার পর মানুষকে টিলার মধ্যে নির্দিষ্ট অঞ্চলে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো। এ অঞ্চল পীরের তাবু থেকে সামান্য দূরে।

এ অঞ্চলও ভাল করে ঘেরাও দেয়া। তাদেরকে সেখানে বসার আদেশ দেয়া হলো, তবে কাউকে টিলার উপরে পীরের জন্য সংরক্ষিত এলাকায় যাওয়ার অনুমতি দেয়া হলো না। বসার পর সেখান থেকে কারো উঠে যাওয়ারও কোন অনুমতি ছিল না।

সবাইকে বলা হলো চুপ করতে, আরো বলা হলো, 'তিনি যদি কারো ত্রুটির জন্য সামান্য অসন্তুষ্ট হন তবে সকলের উপরেই গজব নাজিল হবে।'

লোকজন আদবের সাথে বসে গেল সেখানে। তাদের সামনে সুন্দর করে মঞ্চ সাজানো। মঞ্চের ওপর মখমলের গালিচা, পিছনে লম্বা পর্দা টাঙ্গানো। পর্দার ওপরে সোনালী রংয়ের তারকা চমকাচ্ছে। মশাল ও মোমবাতির আলোয় ওগুলি যেন চমকায় সে জন্য বিশেষ ভাবে তা সাজানো হয়েছে।

পর্দার পিছনে সমান্তরাল জায়গায় অচেনা লোকেরা গর্ত খুড়েঁছিল। টিলার পিছনে কিছুটা জায়গা সমান, সেখানে রং-বেরংয়ের নানা আকৃতির তাবু টানানো। দর্শকদের মধ্যে এমন ভাব গাম্ভীর্য বিরাজ করছিল যে, কেউ কারো সাথে কানাঘুষা করতেও ভয় পাচ্ছিল।

যে রাতে সাদিয়া নিখোঁজ হয়েছিল এটা তার পরের রাত। সামনের পর্দা ধীরে ধীরে নড়ে উঠলো। পর্দার তারাগুলো আকাশের তারকার মত চমকাচ্ছিল। এমন মৃদু ও মোহন সুরে বাজনা বেজে উঠল, যে মধুর সুরের সাথে কারো পরিচয় ছিল না। কেউ এ সুরের নাম জানে না এবং এমন সম্মোহনী সুর তারা কেউ কোনদিন শোনেওনি। এ সুরের গুঞ্জনে ছিল যাদুর প্রভাব। মরুভূমির নিঝুম রাতে এই মিহি সুরের প্রভাব বড়ই মর্মস্পর্শী ও অন্তরভেদী মনে হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই সুরের ঢেউ শ্রোতাদের ওপর দিয়ে হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে।

দর্শকরা মঞ্চে কাউকে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু শুনতে

পাচ্ছে হৃদয় পাগল করা অলৌকিক সুর। দর্শকবৃন্দ বার বার এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে, কখনোবা অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে বুঝতে চেষ্টা করছে, কোত্থেকে ভেসে আসছে এই সুর। কিন্তু তারা কিছুই দেখতে পাচ্ছে না।

বাজনার সাথে এবার যুক্ত হলো আরেক ধরনের শব্দ। মনে হচ্ছে অসংখ্য লোক মিলিত কণ্ঠে একই সুর গুণ গুণ করছে। এর মধ্যে মেয়েদের কণ্ঠও শোনা যাচ্ছে। আস্তে আস্তে সেই শব্দ জোরালো হলো। সেই সাথে দুলতে শুরু করল সামনে রহস্যময় মঞ্চের বড় পর্দা।

উপস্থিত দর্শকরা এই বিশ্ব সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঘর, সংসার, সমাজ, সভ্যতা সবকিছুর কথা ভুলে গিয়ে তারা এখন এক ধ্যানে, এক মনে নিরব নিস্তব্ধ আকাশের তলে অপূর্ব সম্মোহনী পরিবেশে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইল সেই দোলায়মান পর্দার দিকে, যেখানে আকাশের তারার মতই শোভা পাচ্ছিল ঝিকিমিকি তারার মেলা।

সমস্ত মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল সেদিকে। সহসা কোথা থেকে যেন গুঞ্জন উঠলো, 'তিনি আসছেন, যাঁকে আল্লাহ আকাশ থেকে পাঠিয়েছেন তিনি আসছেন! তিনি তোমাদের অন্তরে ও মগজে খোদার সত্য বাণী নাজিল করবেন।'

মঞ্চের পর্দা সরিয়ে ভেতর থেকে একজন মানুষ এগিয়ে এলো মঞ্চে। সে একজন রক্ত মাংশের মানুষ হলেও এই সঙ্গীতের লহরী, আলোর রহস্যময়তা ও ভাবগম্ভীর পরিবেশে তাকে মনে হলো অন্য কোন অপার্থিব জগতের বাসিন্দা। তার মাথায় হালকা সোনালী রংয়ের লম্বা চুল। সে চুল তার কাঁধ

পর্যন্ত নেমে এসেছে। মুখমণ্ডল গোলগাল, নিটোল ও সজীব। চেহারায় দুধে-আলতা রঙ মেশানো। দাড়ি পরিপাটি করে ছাটা এবং আঁচড়ানো। দাড়ির রঙও চুলের মত সোনালী।

লোকটা বেশি লম্বাও না, খাটোও না, মাঝারি আকৃতির। গায়ে সবুজ রংয়ের মাঝে সোনালী জরির আলখেল্লা। মশালের আলোয় সে জরির নকশা চমকাচ্ছিল। তার চোখে ছিল অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। আপাদমস্তক তিনি এমন আকর্ষণীয় ছিলেন যে, দর্শকদের তাক লেগে গেল।

বাজনার তালে তালে মানুষের গুণ গুণ ধ্বনি অপূর্ব মোহময় আবেশ তৈরী করল। তিনি এতকাল তার অপূর্ব মোজেজার কাহিনী প্রচার করে মানুষকে আগে থেকেই বিমোহিত করে রেখেছিলেন, এবার উপস্থিত জনতার চিন্তা চেতনায় শিহরণ তুলে তাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। দর্শকরা তাকে দেখে প্রথমে মাথা নত করল এবং মজলিশের আদব অনুযায়ী পেটের ওপর হাত রেখে এমন ভাবে দাঁড়ালো যেন নামাজে দাঁড়িয়েছে।

সেই রহস্যময় লোক পর্দার সামনে এসে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বললো, 'তোমাদের ওপর সেই খোদার রহমত বর্ষিত হোক, যিনি তোমাদের এ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, যিনি তোমাদেরকে চোখ দিয়েছেন দেখার জন্য, কান দিয়েছেন শোনার জন্য। তিনি তোমাদের বুদ্ধি দিয়েছেন যাতে তোমরা চিন্তা করতে পারো, জবান দিয়েছেন যাতে কথা বলতে পারো। কিন্তু তোমাদের মতই একদল মানুষ যাদের চোখ আছে, কান আছে, তোমাদের মত করে তারা কথাও বলে, অথচ তারা তোমাদেরকে গোলাম বানিয়ে খোদার নেয়ামত

থেকে, দুনিয়ার আরাম আয়েশ থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে।

এখন তোমাদের অবস্থা এমন, তোমাদের চোখ আছে কিন্তু তোমরা কিছুই দেখতে পাও না। তোমাদের কান আছে কিন্তু সত্য কথা শুনতে পাও না। তোমাদের মাথায় বুদ্ধি আছে কিন্তু চিন্তা করো না বলে সেখানে সন্দেহ ও মিথ্যা ধারণা বাসা বেঁধে আছে। তোমাদের জিহ্বা কথা বলতে পারে কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে তোমরা একটি কথাও বলতে পারো না, যারা তোমাদের গোলাম বানিয়ে রেখেছে।

তারা তোমাদের ঘোড়া, উট এমনকি তোমাদের যুবক ছেলেগুলোকে কিনে নিয়েছে। তারা তোমাদের সন্তানদের দিয়ে এমন ভাবে যুদ্ধ করায় যেমন কুকুরেরা লড়াই করে। তারা তোমাদের উট ও ঘোড়ার শরীর তীর ও বর্শা মেরে ঝাঝরা করে দেয়, তোমাদের যুবক সন্তানরা যুদ্ধে নিহত হলে তাদের লাশগুলো মরুভূমিতে ফেলে রাখে যেন লাশগুলো শেয়াল, কুকুর ও শকুনে খেয়ে যেতে পারে।

আমি সেই চোখ নিয়ে এসেছি, যে চোখ ভবিষ্যতের দৃশ্য দেখতে পারে আর মানুষের মনে কি আছে সে কথা শুনতে পারে। আর আমার যে কান আছে সে কান খোদার আওয়াজও শুনতে পায়। আমি আমার বুদ্ধি বিবেক দিয়ে শুধু মানব জাতির কল্যাণ ও মঙ্গলই চিন্তা করি। আমি মানুষকে শোনাই খোদার পায়গাম, খোদার কণ্ঠের ধ্বনিই প্রতিধ্বনি করি আমি।'

'তুমি কি অবিনশ্বর, তোমার কি মৃত্যু নেই?' দর্শকের মধ্যে থেকে কেউ একজন ভরাট গলায় প্রশ্ন করলো। মুহূর্ত কালের জন্য খামোশ হয়ে গেলেন পীর সাহেব। এমন ভাব

করলেন, যেন, কেউ তার সাথে এ ধরনের বেয়াদবী করতে পারে, এ কথা তিনি কল্পনাও করেননি। লোকজনও খামোশ মেরে গেল। সবাই চুপচাপ, ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। এই বেয়াদবীর পরিণামে কি ধরনের গজব নেমে আসতে পারে তাদের ওপর এ চিন্তায় অস্থির হয়ে পড়ল লোকজন।

পীর সাহেব ধাতস্ত হয়ে বললেন, 'তুমি পরীক্ষা করে নাও! আমার বুকে তীর মারো, দেখো সে তীর আমার বুকে বিদ্ধ হয় কিনা?'

তার কথা বলার ভঙ্গিতে দৃঢ় প্রত্যয় ও এমন এক বলিষ্ঠতা ছিল, লোকজনের মধ্যে তা যাদুর মত প্রভাব ফেলল। পীর সাহেব আবার বললেন, 'এখানে কোন তীরন্দাজ আছে? থাকলে আমার বুকে তীর চালাও।'

ভীড়ের মধ্যে নিরবতা আরও বেড়ে গেল। পীর সাহেব আরও বলিষ্ঠ ও রাগান্বিত কণ্ঠে বললেন, 'আমি আদেশ দিচ্ছি, কারো কাছে তীর থাকলে সে যেন সামনে আসে ও তীর চালায়।'

দর্শকদের মধ্য থেকে চারজন অচেনা তীরন্দাজ উঠে দাঁড়াল এবং মঞ্চের দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে এল। এরা কেউ সাদিয়ার গ্রামের লোক নয়। লোকজন ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে গেল।

পীর সাহেব বললেন, 'তোমরা আমার থেকে ত্রিশ কদম পিছিয়ে দাঁড়াও।' তারা পীরের কাছ থেকে গুণে গুণে ত্রিশ কদম পিছিয়ে দাঁড়ালো।

'ধনুকে তীর লাগাও!'

চারজনেই কোষ থেকে তীর বের করে ধনুকে লাগালো।

'আমার বুকের মাঝখানে নিশানা করো।'

তারা ধনুকে তীর টেনে নিশানা করলো।

'তোমরা ভয় পেয়ো না, আমি মারা যাব এ চিন্তা করে নিশানা নষ্ট করো না, শক্ত করে তীর টেনে সোজা আমার বুক বরাবর ছেড়ে দাও।'

তারা ধনুক নামিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

'আমার বুকে নিশানা করো, তীর চালাও।' পীর সাহেব বললেন, 'নতুবা তোমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছো সেখানেই ভস্ম হয়ে যাবে।'

তীরন্দাজরা মৃত্যুর ভয়ে আবার ধনুক উঁচু করে ধরলো এবং তার বুক বরাবর নিশানা করলো। দর্শকরা রুদ্ধশ্বাসে তাকিয়ে রইল এই জীবন্ত নাটকের দিকে। মিউজিকের মিষ্টি সুর থেমে গেল। সবার মনে শংকা ও বেদনার দুঃসহ ভার। তারা কি করবে, কি তাদের করা উচিত, কিছুই ভেবে পেল না।

অকস্মাৎ চারটি তীরই শাঁ করে ছুটে এসে পীর সাহেবের বুকের মধ্যে বিঁধে গেল। দর্শকরা চোখ বন্ধ করে ফেলল। যখন তারা আবার চোখ খুলল, দেখল, তিনি সেখানেই দাঁড়িয়ে আছেন এবং তার ঠোঁট উদ্ভাসিত হয়ে আছে প্রসন্ন হাসিতে।

পীর সাহেব এবার বললেন, 'চারজন খঞ্জর হাতে সামনে আসো। তীরন্দাজরা সরে যাও।'

তীরন্দাজরা বিস্ময়ে বোবা হয়ে গিয়েছিল। পীর সাহেবের কথায় সম্বিত ফিরে পেয়ে বিহব্বল হয়ে সরে গেল ওখান থেকে।

চারজন খঞ্জরধারী একদিক থেকে সামনে এগিয়ে এলো। তাদের আদেশ দেয়া হলো, 'খঞ্জর হাতে নাও এবং আমার থেকে দশ কদম দূরে গিয়ে দাঁড়াও।'

তারা হুকুম তামিল করল। পীর সাহেব বললেন, 'তোমরা কি ওখান থেকে আমার বুকে খঞ্জর নিক্ষেপ করতে পারবে?'

চারজনই হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল। পীর সাহেব বললেন, 'তাহলে তোমরা এখন একত্রে আমার বুকে খঞ্জর ছুঁড়ে মারো।'

চারজনই পূর্ণ শক্তি দিয়ে খঞ্জর নিক্ষেপ করলো। ছুরি চারটি নিমিষে পীর সাহেবের বুকে বিদ্ধ হয়ে গেল, একটাও খুলে পড়ল না। পীর সাহেব আগের মতই দাঁড়িয়ে হাসতে লাগলেন।

দর্শকের ভীড়ের মধ্য থেকে 'মারহাবা! মারহাবা!' ধ্বনি উঠল। কেউ একজন বলে উঠল, 'নিশ্চয়ই তার হাতে মৃত্যুর ফেরেশতা বন্দী আছে।'

'আমি অমর কিনা এ প্রশ্ন যে করেছিলে, তুমি কি সে প্রশ্নের উত্তর পেয়েছো?' বললেন পীর সাহেব।

এক মরুচারী বেদুইন দৌড়ে তার কাছে এল এবং তার পায়ের কাছে সিজদায় পড়ে গেল। 'মেহেরবানী করে আমায় ক্ষমা করুন। আমি আপনাকে প্রশ্ন করে যে অমার্জনীয় অপরাধ করেছি তার থেকে আমাকে মুক্তি দিন।'

পীর সাহেব ঝুঁকে তাকে টেনে তুলে বললেন, 'যাও, তোমার ওপর খোদার রহমত হোক।'

ভীড়ের মধ্য থেকে একজন বুড়োমত লোক উঠে

দাঁড়ালো এবং পীর সাহেবের পায়ের কাছে এসে বসে পড়ে বললো, 'আপনি কি মৃতের দেহে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারেন? খোদা আমাকে একটাই ছেলে দিয়েছিল, ভরা যৌবনে এসে ছেলেটি মারা গেল। লোক মুখে শুনেছি, আপনি মৃতকে জীবিত করতে পারেন। আমি আমার সন্তানের লাশ নিয়ে অনেক দূর থেকে এসেছি। আমার এই বৃদ্ধ বয়সের প্রতি একটু রহম করুন, আমার সন্তানের জীবন ফিরিয়ে দিন।' বৃদ্ধ পীর সাহেবের পা ধরে কাঁদতে লাগলো।

'কোথায় তোমার ছেলের লাশ?'

বৃদ্ধ চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো এবং একদিকে হাত তুলে কাউকে ইশারায় ডাকলো।

চারজন লোক কাফনে ঢাকা একটি লাশ এনে পীর সাহেবের সামনে রাখলো। লাশটি আনা হলো কাঠের খাটিয়ায় করে। তারা যখন তার সামনে লাশটি রাখলো তখন তিনি বললেন, 'একটি মশাল আনো, লাশটি উঠাও আর সমস্ত লোকদের দেখাও, এটা জীবিত না মৃত।

লাশটির মুখ থেকে কাফনের কাপড় সরিয়ে সবার সামনে দিয়ে ঘুরিয়ে আনা হলো। একজন মশাল হাতে লাশের সাথে সাথে থাকল। সবাই দেখলো, লাশের চেহারা সাদা, ফ্যাকাশে। সবার দেখা শেষ হলে লাশটি আবার পীর সাহেবের সামনে এনে রাখা হলো।

মিউজিকের সুর বদলে গেল। আগের চেয়েও করুণ সুর মুর্চ্ছনা ও বেদনার রেশ ছড়িয়ে পড়ল আকাশে বাতাসে। পীর সাহেব দু'বাহু আকাশের দিকে তুলে বলতে থাকলেন, 'জীবন ও মৃত্যুর মালিক হে খোদা, তুমি তোমার বেটা ঈসাকে শুলের

হাত থেকে বাঁচিয়েছো। যদি তোমার বেটা ও তার ক্রুশচিহ্ন সত্য হয় তবে আমাকে সেই শক্তি দান করো যেন আমি এই হতভাগ্য বৃদ্ধের সন্তানকে জীবন দিতে পারি।'

তিনি ঝুঁকে লাশের কাফনে হাত বুলাতে লাগলেন আর মুখ দিয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলেন। লোকজন সে মন্ত্রের কোন শব্দ বুঝতে পারলো না, তবে এক সময় দেখতে পেল, পীর সাহেবের হাত দু'টি থরথর করে কাঁপছে। মনে হলো কাফনের ভেতরে লাশটাও নড়ছে। পীর সাহেব তার হাত বুলানো দ্রুততর করলেন, লাশের নড়াচড়াও দ্রুততর হলো। এক সময় দেখা গেল কেবল লাশ নয়, পুরো খাটিয়া কাঁপছে।

মানুষ ভয়ে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরল। মেয়েদের মধ্য থেকে কেউ একজন চিৎকার করে উঠল। তারা এক ভয়ানক বিভৎস দৃশ্যের সামনে বসেছিল। পীর সাহেবের বুকে তখন চারটি তীর ও চারটি খঞ্জর বিঁধে আছে আর তিনি এই তীর ও খঞ্জর বুকে নিয়েই একজন মৃত মানুষকে জীবিত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছেন। এই দৃশ্য এতই ভীতিজনক ছিল যে, ভয়ে কয়েকজন মুর্চ্ছা গেল।

হঠাৎ কাফন শুদ্ধ লাশ খাটিয়ার ওপর সোজা হয়ে বসে পড়লো। পীর সাহেব নিজ হাতে কাফন খুলে দিলে লোকটি চোখ মেলে এদিক ওদিক তাকিয়ে বললো, 'আমি কি পবিত্র জগতে পৌছে গেছি?'

'না!' পীর সাহেব বললেন, 'তুমি এখনো দুনিয়াতেই আছো, যেখানে তুমি জন্ম নিয়েছিলেন। যাও, তোমার বাবার বুকে বুক মেলাও।' তিনি যুবককে হাত ধরে টেনে দাঁড়

করিয়ে দিলেন।

পিতা এগিয়ে সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলো এবং অধীর হয়ে তার মুখে চুমো দিতে লাগল। তার চোখ থেকে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এক সময় আবেগ একটু সামলে নিয়ে পীর সাহেবের পায়ের কাছে সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। বসে থাকা জনতা উত্তেজনায় উঁঠে দাঁড়িয়েছিল।

তারা এ অভাবিত দৃশ্য দেখে অভিভুত হয়ে পরস্পর কানাকানি করছিল। তারা নিজের চোখে জীবনের সবচে আশ্চর্যজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করল। তারা দেখল, কাফনে জড়ানো একটি লাশ তাদের চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে নিজের পায়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। পীর বাবা অসাধ্য সাধন করতে পারেন, মুর্দাকে জিন্দা করতে পারেন, এ দৃশ্য দেখার পরও এ কথা কে অবিশ্বাস বা অস্বীকার করবে?

বাবা সন্তানকে নিয়ে দর্শকের ভীড়ের দিকে এগিয়ে গেল এবং সামনের দিকে একটু জায়গা নিয়ে বসে পড়ল।

'আমি আর কোন মুর্দাকে জিন্দা করবো না।' পীর সাহেব বললেন, 'জীবন ও মৃত্যু খোদার হাতে, এ কাজ অন্য কারো করা উচিত নয়। আমি যে খোদার প্রেরিত দূত এটা দেখানোর জন্যই খোদার কাছ থেকে এ অনুমতি নিয়েছিলাম। বলেছিলাম, আমি যে তোমার দূত এটা প্রমাণ করার জন্য তুমি আমাকে এ শক্তি দান করো, যেন আমি মৃত ব্যক্তির দেহে জীবন ফিরিয়ে দিতে পারি। খোদা আমার প্রার্থনা কবুল করেছেন, সীমিত পর্যায়ে ব্যবহারের শর্তে তিনি আমাকে এ শক্তি দিয়ে ধন্য করেছেন।'

'তুমি কি যুদ্ধে নিহত সৈন্যকে জিন্দা করতে পারো?'

জনতার মধ্য থেকে একজন জিজ্ঞেস করলো।

'না! যুদ্ধে মরা সৈন্যদের ওপর খোদা এতই অসন্তুষ্ট যে, তাকে আর দ্বিতীয়বার জীবন দেন না। পরবর্তী জীবনে তাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করেন। খোদার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি মানুষকে মানুষ হত্যা করবে এ জন্য খোদা মানুষ সৃষ্টি করেননি। বরং মানুষকে তিনি সৃষ্টি করেছেন এ জন্য যে, সে এ পৃথিবীতে আরো মানুষ আসার পথ তৈরী করবে। এ জন্যই আজ যে ছেলে, কাল সে বাবা হয়। সেই ছেলের ঔরসে আবার নতুন শিশু জন্মগ্রহণ করে। একদিন সেও আবার বাবা হয়ে যায়। এভাবেই পৃথিবীতে আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি মানুষের বৃদ্ধি ঘটতে থাকে।

মানুষ যেন এ কাজে উৎসাহিত হয় সে জন্য আল্লাহ তোমাদেরকে চারটি স্ত্রী রাখার জন্য বলেছেন। সন্তান জন্মদানের এ প্রক্রিয়ায় ব্যস্ত থাকার নামই এবাদত। নারী ও পুরুষের এটাই জীবনের আসল কাজ। তারা সন্তান পয়দা করবে, সেই সন্তান আবার বাচ্চা জন্ম দিতে সচেষ্ট হবে, তার ছেলেও বাপের মত সক্রিয় হবে এ কাজে। এভাবেই আল্লাহর সৃষ্টির ধারাকে বেগবান করে তারা আল্লাহর প্রিয় বান্দায় পরিণত হবে।'

পীর সাহেব যখন তার কেরামতি দেখাচ্ছিলেন, তখন দু'জন লোক টিলার পিছন দিয়ে লুকিয়ে যেখানে রঙ-বেরঙয়ের তাবু টানানো ছিল সন্তর্পনে সেদিকে এগিয়ে গেল। এই লোক দু'জন ছিলেন ইমাম সাহেব ও মাহমুদ বিন আহমদ। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সাদিয়া এখানেই কোথাও আছে। সাদিয়াকে খুঁজে

বের করার উদ্দেশ্যেই তাদের এ অভিযান।

তাবুর কাছে পৌঁছে তারা দেখতে চাইল, তাবুগুলোতে কি আছে এবং সার্দিয়াকে এর কোনটিতে লুকিয়ে রেখেছে কিনা!

তাবুর চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাত্র তিনটি তাবুর ভেতর আলো দেখা যাচ্ছে। তিনটি তাবুরই পর্দা দু'দিক থেকে আটকানো, ভেতরে কি আছে বাইরে থেকে তার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। তাবুগুলোর চারদিকে পাহারা তেমন জোড়ালো মনে হচ্ছে না। এদিক ওদিক তাকিয়ে তারা আশপাশে কাউকে দেখতে পেল না। অন্ধকারে দৃষ্টি বেশি দূর যায় না, তাই পাহারাদার থাকলেও দেখার উপায় নেই।

পা টিপে সামনে এগুলো দু'জন। তাবু থেকে বেশ কিছুটা দূরে দু'তিনজন লোকের কথা শোনা গেল। ওরা দেখে ফেললে বিপদ হবে ভেবে তারা তাদের দৃষ্টি এড়িয়ে সামনে এগুলো। তাবুর একেবারে পাশে এসে থামল দু'জন।

তাবুর ওপাশ থেকে বাজনার সুর ভেসে আসছে। কিন্তু কোথায় বসে বাজনাদাররা এ সুর তুলছে তা ওরা দেখতে পেল না।

তারা সবেমাত্র তাবুর কাছে পৌঁছেছে, এখনো কোন তাবুতে হানা দেয়নি, এমন সময় একটি তাবুর মধ্যে মেয়েলি কণ্ঠ এবং হাসাহাসির শব্দ শুনতে পেল।

ইমাম সাহেব ও মাহমুদ অনুমান করলো, যে তিনটি তাবুতে আলো জ্বলছে তারই কোনটা থেকে এ শব্দ ভেসে এসেছে। তারা সেই শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে গেল।

তাবুর কাছে গিয়ে লুকিয়ে থেকে ওরা মেয়েদের কথা শোনার চেষ্টা করলো। একটি নারী কণ্ঠ বলছে, 'এখানেও খেলা বেশ ভালই জমে উঠেছে, কি বলিস?'

অন্য মেয়ের গলা, 'হুহ! এমন আহাম্মক ও মূর্খ জাতি পৃথিবীতে আর একটা আছে কিনা সন্দেহ।'

'মুসলমানদের ধ্বংস করার জন্য হারমান ভালই চাল চেলেছে। আর রবার্ট পারেও বাবা!'

'এমন চমৎকার ভিলকিবাজীর খেলা আমি আর দেখিনি। সে যেভাবে সবকিছু ম্যানেজ করে, দেখলে মনে হয় একেবারেই বাস্তব। আমারই তো ধাঁধাঁ লেগে যায়।'

'যা বলেছিস! এত বিশ্বাসযোগ্য করে ধোঁকা দেয়ার মধ্যে একটা আর্ট আছে। রবার্ট সেটা ভালই রপ্ত করেছে। এই আহাম্মকদের বিপদগামী করা তার কাছে কোন ব্যাপারই না।'

অন্য একটি মেয়ে বললো, 'ওই মেয়েটার খবর কিরে?'

'কোন মেয়েটা?'

'ঐ যে আমাদের নতুন অতিথি।'

'নতুন মেয়েটার কথা বলছিস! মানতেই হবে, ওই মেয়ে আমাদের সকলের চেয়ে বেশি সুন্দরী!'

'আহা রে! ময়না আজ সারাদিন যা কেঁদেছে!' বললো অন্য একটি মেয়ে ।

'আর কান্না লাগবে না। আজ রাতেই তার কান্না বন্ধ হওয়ার অসুধ দেয়া হবে।' অন্য এক মেয়ে বললো, 'পীর সাহেব এলান করেছেন, আজ রাতে যেন টিয়া পাখিকে সাজিয়ে উনার তাবুতে পাঠিয়ে দেয়া হয়।'

'তাই তো! এতবড় কেরামতি দেখানোর পর রবার্টের

তো একটু পুরস্কার পাওয়াই উচিত।'

'আহা রে! মেয়েটা একেবারে কইতরের বাচ্চা! দুনিয়ার স্বাদ আহলাদ মনে হয় এখনো চেখেই দেখেনি!' মেয়েটি মুখ দিয়ে চুকচুক শব্দ করলো।

'একেই বলে কপাল! প্রথম রাতেই রবার্টের হাতে! রবার্ট পারেও বাবা!'

মেয়েরা এ কথায় খিল খিল করে হেসে উঠল। একজন বললো, 'ঠিক বলেছিস। মেয়েদের সুখের জন্য আল্লাহ যে কি চিজ দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন, রবার্টের হাতে না পড়লে তা বুঝাই যায় না!'

এভাবে মেয়েরা অশ্লীল আলাপ চালিয়েই যেতে থাকল। ইমাম সাহেব ও মাহমুদ বুঝল, এ নতুন পাখি সাদিয়া ছাড়া আর কেউ নয়। তারা আরও বুঝল, সরলমতি মুসলমানদের বিপথগামী করার জন্য এ এক জঘন্য চক্রান্ত। এ কোন পীর নয়, তার কেরামতি ও মোজেজা আসলে এক ধরনের ভিলকিবাজী খেলা। অশিক্ষিত মুসলমানদের ঈমান ক্রয়ের জন্যই সে মুর্দাকে জিন্দা করার খেল দেখায়।

ইমাম সাহেব মাহমুদের কানে কানে বললো, 'এই মেয়েদের অশ্লীল কথাবার্তা ও শরাবের গন্ধই বলে দিচ্ছে, এরা কারা, আর কি করছে? ওরা মুসলমানদের ঈমান ক্রয়ের জঘন্য খেলায় মেতে উঠেছে। কায়রোতে এখনি এ খবর পাঠাতে হবে।'

মাহমুদের মধ্যে পীরের ব্যাপারে যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল এ আলোচনা শোনার পর তা মুহূর্তেই কেটে গেল। সে বলল, 'আমি তো ভেবেছিলাম, ইনি কামেল পীর হলেও হতে

পারেন।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'কেউ মৃতকে জীবিত করতে পারে না। এ পীরের ব্যাপারে আমি এমনটাই সন্দেহ করেছিলাম। এই রহস্যময় ব্যক্তি মানুষের মধ্যে পীরের ব্যাপারে যে ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে তাকে ব্যবহার করে লোকদের বিভ্রান্ত করছে। এ ধরনের অলৌকিকতা ও কেরামতির অবকাশ ইসলামে নেই। আল্লাহর নবীর চেয়ে অধিক কামেল কোন মানুষ দুনিয়ায় আসেনি। যেখানে আমাদের প্রিয় নবী ইসলামকে বিজয়ী করার জন্য অসংখ্য ময়দানে সরাসরি লড়াই করেছেন সেখানে জেহাদের পথ ছেড়ে যারাই মোজেজার আশ্রয় নেবে, মনে রাখবে ওরা ইসলামের দুশমন।'

'অথচ তাদেরই আমরা আমাদের পীর বানিয়ে তাদের হাতে বাইয়াত নিয়ে আমাদের ঈমান তুলে দিয়েছি ওদের হাতে। ওরা যা সঠিক বলে তাকেই আমরা সঠিক মনে করি, ওরা যে পথে চালায় সেই পথে এগিয়ে চলি আমরা। আর মনে করি আমরা ইসলামের সরল সঠিক পথেই এগিয়ে চলেছি।'

'দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্য অস্ত্র অপরিহার্য। আল্লাহর রাজত্বে পশুত্ব আর বর্বরতা যেন মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে সে জন্যই ইসলাম এসেছে। পৃথিবীতে দুষ্টের রাজত্ব থাকবে অথচ মুসলমানের হাতে অস্ত্র থাকবে না, অন্তরে জেহাদের জযবা থাকবে না, এটা হতে পারে না। যিনি মুসলমানদের জেহাদের জন্য ডাক দিতে পারেন, একমাত্র তিনিই হতে পারেন মুসলিম সমাজের নেতা।

যারা মুসলমানদের হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সে হাতে তুলে দেয় তসবি, আল্লাহকে ভয় করার আহবান না জানিয়ে অলৌকিক মুজেজা দেখিয়ে তার ক্রোধকে ভয় করতে শেখায়, সে লোক কামেল তো নয়ই, বরং সে ধোঁকাবাজ, প্রতারক। ইসলামকে পুঁজি করে সে নিজের আখের গোছাতে চায়। এ ধরনের লোক সব যুগে, সর্ব কালে ছিল, আছে এবং থাকবে। মুসলিম জাতিকে এদের ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে এবং কেউ যেন বিভ্রান্ত না হতে পারে সে জন্য অন্যকে সতর্ক করতে হবে।'

ওরা মেয়েদের সেই তাবুর কাছ থেকে সরে এল। অন্য যে তাবু দু'টোতে বাতি জ্বলছে সেদিকে এগিয়ে গেল এবার। এর মধ্যে একটি তাবু বেশ বড়। তাবুটির কাছে গিয়ে থামল ওরা। টিলার সাথে সংলগ্ন এবং প্রায় সমান্তরাল ছিল এই তাবুটি। টিলার চড়াই ও তাবুর মাঝখানে মাত্র হাত দুয়েক ফাঁকা জায়গা।

তারা সেখানে গিয়ে দেখলো, তাবুর পর্দা দুদিক থেকে টেনে এনে মাঝখানে রশি দিয়ে বাঁধা হয়েছে। বাঁধে ঢিল পড়ায় মাঝখানে এক চিলতে একটু ফাঁক হয়ে আছে। সেই ফাঁক দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল ওরা।

ভেতরে একটা বড়সড় আরাম কেদারা ও ডাবল বিছানা। চেয়ারটি গদি মোড়া এবং মনোরম মখমল কাপড়ে ঢাকা। বিছানায় মোটা তোষকের ওপর সুদৃশ্য চাদর। এক পাশে বিশাল একটি মোমদানিতে দু'টি মোমবাতি জ্বলছে। বিছানার অন্য পাশে শরাবের সোরাহী ও রূপোর পানপাত্র। ভেতরের শান শওকত দেখে মনে হচ্ছে, কোন ধনাঢ্য সরদার বা

আমীরজাদার তাবু। তাবুতে দু'জন মহিলার একজন সাদিয়া। অন্য মেয়েটি সাদিয়াকে কনের সাজে সাজাচ্ছে। সাদিয়ার মুখ ফ্যাকাশে। নিঃশব্দ কান্না ঝরে পড়ছে সে মুখ থেকে।

'আজকের এই দিনে তুমি কাঁদছো?' মহিলাটি তাকে শান্তনা দিয়ে বললো, 'একটু পরই তুমি আনন্দ সাগরে সাঁতার দেবে। খুশির বন্যা বয়ে যাবে এই তাবুর ভেতর। তরপর দেখবে তুমি আর নিজেকেই চিনতে পারছো না। তুমি যে কত ভাগ্যবতী সেটা তখন বুঝবে। স্বর্গীয় পীর মাটির পৃথিবীতে বসবাস করতে এসে তোমাকে পছন্দ করে ফেলেছে,- এ তো তোমার সৌভাগ্য! তিনি তো শুধু তোমার জন্যই এ গ্রামে এসেছেন।

আজ থেকে মাসখানেক আগে তিনি গায়েবী চোখে তোমাকে দেখেন। সেই থেকে এখানে আসার জন্য পেরেশান হয়ে যান তিনি। তোমার কাছে আসার জন্য ক্রমাগত বিশ দিন একনাগাড়ে পথ চলেছেন তিনি। আল্লাহর কি অশেষ মেহেরবানী তোমার প্রতি, যদি তিনি না আসতেন তবে তোমার বিয়ে হতো কোন মরুচারী রাখালের সাথে, নয়তো কোন নারীর দালালের হাতে তুমি বিক্রি হয়ে যেতে।'

সাদিয়ার ওপরে এসব কথার কোন প্রভাব পড়ছে কিনা বুঝা গেল না। তবে সে মেয়েটির কথার কোন প্রতিবাদ না করে চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল।

মাহমুদ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। ইমাম সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'অস্থির হয়ো না, সাদিয়াকে যখন পাওয়া গেছে তাকে নিশ্চয়ই উদ্ধারও করা যাবে। আরেকটু অপেক্ষা করো, দেখিই না এরপর কি ঘটে।'

বেশীক্ষণ তাদের অপেক্ষা করতে হলো না। মঞ্চ থেকে কে যেন ঘোষণা করলো, 'খোদার প্রেরিত পুরুষের হে ভক্তকূল! যার হাতে আমাদের জীবন ও মৃত্যু, যার চোখ গোপন রহস্য দেখতে পারে, অন্ধকার রাতে যিনি আকাশে ঘুরে বেড়ান, এখন তিনি খোদার সাথে দেখা করতে যাবেন। তোমরা এখন কেউ আকাশের দিকে তাকাবে না, তিনি এবং তার সঙ্গীরা যে তাবুতে থাকেন সেদিকে কেউ যাবে না। এই অন্ধকার রাতে কেউ টিলার ওপরও চড়বে না।

যদি আমার নির্দেশ অমান্য করে কেউ আকাশের দিকে তাকাও তার চোখ চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যাবে। যদি কেউ তাবু বা টিলার দিকে যেতে চেষ্টা করো তবে পঙ্গু হয়ে যাবে তোমাদের হাত-পা। যে যেখানে আছো, বসে বসে আল্লাহর জিকির করো। আগামীকাল রাতে তিনি তোমাদের মনের গোপন ইচ্ছা ও আশা আকাঙ্খার কথা বলবেন এবং আল্লাহর হুকুমে তোমাদের সমস্যা দূর করবেন।'

ইমাম সাহেব ও মাহমুদ সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল। তাবুর মধ্যে যে মহিলা সাদিয়াকে সাজাচ্ছিল সে আরেকবার উপদেশ দিল, 'শোন মেয়ে, তিনি আসছেন। তার সামনে কোন বেয়াদবী করবে না।'

তিনি এসে গেলেন এবং সামনের দিক দিয়ে তাবুতে প্রবেশ করলেন। ইমাম সাহেব ও মাহমুদ অবাক হয়ে দেখলো, এখনো তার বুকে চারটি তীর ও চারটি খঞ্জর বিঁধে আছে।

সাদিয়া এ দৃশ্য দেখে দু'হাতে মুখ ঢেকে ভয়ে চিৎকার করে উঠল। পীর সাহেব বললেন, 'ভয় পেয়ো না সুন্দরী, এই

মোজেজা আমাকে খোদাই দান করেছেন। আমি তীর ও ছুরির আঘাতে মরি না।' সে সাদিয়ার সাথে গা লাগিয়ে বসলো।

'আমি এমন ভিলকিবাজী একবার কায়রোতে দেখেছিলাম।' ইমাম সাহেব মাহমুদকে কানে কানে বললেন, 'তুমিও ভয় পেয়ো না, আমি জানি তীর ও ছুরি কোথায় বিদ্ধ হয়ে আছে।'

পীরবেশী প্রতারক তাবুর পর্দা রশি দিয়ে বাঁধলো। এদিকে ইমাম সাহেব ও মাহমুদ পিছন থেকে আস্তে করে তাবুর পর্দার বাঁধন খুলে ফেললো। প্রতারক লোকটি আবার গিয়ে সাদিয়ার পাশে বসতেই তারা দু'জন পা টিপে টিপে তাবুর ভেতর প্রবেশ করলো। হঠাৎ লোকটার কি সন্দেহ হলো, সে পিছন ফিরে চাইল এবং সঙ্গে সঙ্গে মাহমুদ ও ইমাম সাহেবকে দেখে উঠে দাঁড়াল।

মাহমুদ হাতের খঞ্জর বাগিয়ে চাপা কণ্ঠে গর্জে উঠলো, 'চুপ, একদম চুপ।' তারপর সাদিয়ার দিকে ফিরে বললো, 'এক কোণায় সরে যাও।'

সাদিয়া সাথে সাথে তাবুর এক কোণে সরে গেল। ইমাম সাহেব লোকটার-পিছনে গিয়ে চাদর উঠিয়ে ছুড়ে মারল লোকটার মাথার ওপর। রবার্ট যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল, কিন্তু অস্ত্রধারী মাহমুদের দিকে নজর থাকায় সে ইমাম সাহেবকে বাঁধা দিতে পারল না, তার আগেই ইমাম সাহেবের ছুঁড়ে মারা চাদরে তার আপাদমস্তক ঢেকে গেল। সাদিয়া তাবু খাটানোর রশি এগিয়ে ধরলে ইমাম সাহেব সেই রশি দিয়ে চাদর সমেত রবার্টকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। ইমাম সাহেব

সাদিয়াকে বললো, 'সাদিয়া, আলোটা নিভিয়ে দাও।'

সাদিয়া চট করে আলো নিভিয়ে দিলে অন্ধকার ঘিরে ধরলো ওদের। অন্ধকার একটু সয়ে এলে ইমাম সাহেব প্রথমে সাদিয়াকে তাবুর বাইরে যেতে আদেশ দিলেন। সাদিয়া বাইরে গেলে মাহমুদ বন্দীর পিঠে খঞ্জরের খোঁচা দিয়ে বললো, 'কোন কথা নয়, যা বলছি তাই করো, নইলে যমের ঘরে পাঠিয়ে দেবো।'

ইমাম সাহেব বন্দীর বাহু ধরে বললেন, 'চলো।'

ইমাম সাহেবের নির্দেশিত পথ ধরে আগে আগে চললো সাদিয়া, রবার্টের বাহু ধরে পাশাপাশি চললেন ইমাম সাহেব, পেছনে বন্দীর পিঠে খঞ্জর ধরে এগিয়ে চলল মাহমুদ। যেদিক দিয়ে তারা তাবুতে প্রবেশ করেছিল সে দিক দিয়েই বের হয়ে টিল্লার উল্টো পাশে চলে এল ওরা। রবার্ট তাবুর চারদিকে পাহারার ব্যবস্থা করেছিল ঠিকই, কিন্তু পাহারাদাররা কোনদিন কোন ঝুঁকির সম্মুখীন হয়নি বলে স্রেফ রুটিন ওয়ার্ক ছাড়া এর আর কোন গুরুত্ব ছিল না তাদের কাছে।

মাহমুদ ধরা পড়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য গত রাতে ওদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে গিয়েছিল। ফলে সরে পড়ার গোপন রাস্তা মাহমুদ আগেই ঠিক করে রেখেছিল। তার ওপর ঘোর অন্ধকার ওদের জন্য ছিল রহমত স্বরূপ। ফলে সহজেই ঢিলেঢালা পাহারার ফাঁক গলে নিরাপদে বেরিয়ে এল ওরা ওই এলাকা থেকে।

টিলা থেকে নেমেই ওরা গ্রামের পথ ধরলো। তবে সোজা পথে না গিয়ে একটু ঘুর পথে এগোলো ওরা। চাদর

দিয়ে চোখ মুখ ঢাকা থাকায় রবার্ট ঠিক ঠাহর করতে পারলো না ওরা কোন-পথ দিয়ে কত দূর এগুচ্ছে।

অভিযান এত সহজে এতটা সাফল্য লাভ করেছে যা মাহমুদের ধারনায়ও ছিল না। ওদের এ অভিযানের টার্গেট ছিল সাদিয়াকে উদ্ধার করা। ঠকবাজদের দলনেতাকে বন্দী করার সুযোগ পাওয়াকে মাহমুদ উপরি পাওনা বলে গণ্য করলো। তারা যখন মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করলো তখন মধ্য রাত পেরিয়ে গেছে।

ইমাম সাহেবের হুজরাখানায় প্রবেশ করলো ছোট্ট দলটি। তখনো সাদিয়া আগে, ইমাম ও রবার্ট মাঝখানে আর মাহমুদ খঞ্জর হাতে সবার পেছনে।

ইমাম সাহেব বাতি জ্বাললেন। ভেলকিবাজদের সরদার রবার্টের মুখোমুখি দাঁড়ালো মাহমুদ। মসজিদের সীমানার গেট এবং হুজরাখানার দরজা বন্ধ করে এলেন ইমাম সাহেব। কামরায় ঢুকে বললেন, 'মাহমুদ, ওর বাঁধন খুলে দাও।'

মাহমুদ লোকটার বাঁধন খুলে দিল। এখন পর্যন্ত তার বুকে তীর ও ছুরিগুলো ঝুলছে। সাদিয়াও হুজরাখানাতেই থাকলো। ওর নিখোঁজ হওয়ার খবর ছড়িয়ে পড়লে মুসলিমবেশী খৃস্টানরা সাদিয়াদের বাড়িতে হামলা করতে পারে বলে আশংকা করলেন ইমাম সাহেব। তিনি নতুন করে কোন ঝুঁকি নিতে চাইলেন না। যদিও এ খবর এখন জানাজানি হওয়ার সম্ভাবনা কম। এমন সফল তেলেসমাতি খেল দেখানোর পর দলনেতা বিশ্রামে থাকবে, ফলে কেউ এখন তাকে বিরক্ত করবে না এটাই স্বাভাবিক।

সবাই জানে, তিনি এখন বিশ্রাম নিচ্ছেন এবং আনন্দ

ফুর্তিতে মেতে আছেন। কেউ তাকে সেই আনন্দের আসর থেকে উঠিয়ে বন্দী করে নিয়ে যাবে এ কথা কারো কল্পনায়ও আসার কথা নয়। ভোরে যখন দেখবে, তাদের নতুন শিকার সাধের ময়না পাখি সরদারকে নিয়ে উড়ে গেছে, তখন তাদের অবস্থা ও ভূমিকা কি হবে ভাবছিলেন ইমাম সাহেব।

ইমাম সাহেব মাহমুদকে বললেন, 'মাহমুদ, পীর সাহেবের গায়ে অস্ত্রপাতি মানায় না, উনার শরীর থেকে ওগুলো খুলে নাও।'

মাহমুদ প্রথমে তীর ও পরে খঞ্জরগুলো টেনে বের করলো। ইমাম সাহেব এবার রবার্টের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হুজুর, দয়া করে আপনার আলখেল্লাটা একটু খোলবেন?'

রবার্ট তার শরীর থেকে আলখেল্লা খুলে ফেললে তার মোজেজার রহস্য উন্মোচিত হলো। দেখা গেল আলখেল্লার ভেতরে গলা থেকে উরু পর্যন্ত নরম শোলার কাঠ লাগানো। তার নীচে শক্ত চামড়া। শোলাগুলো এই চামড়ার সাথে আঠা দিয়ে আটকানো। এমন মজবুত ও নিপূণভাবে এ শোলা লাগানো ছিল, বাইরে থেকে দেখে কিছুই বুঝার উপায় ছিল না। তীর ও খঞ্জরগুলো এই শোলার মধ্যে শক্তভাবে আটকে ছিল।

অপহৃত হলেও রবার্টের মনে কোন ভয় ভীতি ছিল না। সে বরং এটা উপভোগ করছিল। তার ধারনা, এটা একটা সাধারণ ডাকাতির ঘটনা। টাকা পয়সার লোভেই ওরা তাকে অপহরণ করেছে। সে মনে মনে চিন্তা করছিল, যদি তাই হয় তবে ওদেরকে উপযুক্ত সম্মানী দিয়ে দলে টেনে নেবে, কারণ এদের সাহস আছে।

সে ইমাম সাহেব ও মাহমুদকে লক্ষ্য করে বললো, 'তোমাদের চাহিদা কি বলো। স্বর্ণ, ঘোড়া ও উট যা চাইবে এখুনি আদায় করে দেবো। আর যদি আমার সাথে যোগ দাও তবে এত অঢেল সম্পদের মালিক বানিয়ে দেবো তোমাদের, যা তোমরা কল্পনাও করোনি।'

'দুঃখিত হুজুর, আমাদের তো এসব কিছুই চাই না।' বললেন ইমাম সাহেব।

'তাহলে আমাকে কি জন্য ধরে এনেছো? এসব পাগলামীর মানে কি? আমার ভক্তবৃন্দ টের পেলে তোমাদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছো? যদি বাঁচতে চাও তবে জানাজানি হওয়ার আগেই আমাকে যেতে দাও।'

'দুঃখিত, তাও তো পারছি না। আপনাকে এখন মুক্তি দেয়া সম্ভব নয় আমাদের পক্ষে!' এবারও জবাব দিলেন ইমাম সাহেব।

'তাহলে তোমরা কি চাও? কেন আমাকে ধরে এনেছো?'

'আমরা অনেকদিন ধরেই আপনার মত লোকদের খুঁজছিলাম। হাতের কাছে পেয়ে গেলাম, তাই ধরে আনলাম।'

'কিন্তু কেন খুঁজছিলে? আমি কি ক্ষতি করেছি তোমাদের?'

'আপনি আমাদের অনেক বড় ক্ষতি করেছেন। এত বড় ক্ষতি, যা কোনদিন পূরণ হবার নয়।'

'কি সব হেয়ালী করছো! আমি এ সবের কিছুই বুঝতে পারছি না!' বরার্টের চেহারায় চিন্তার ভাঁজ পড়ল।

'সবই বুঝবেন, একটু অপেক্ষা করুন।'

ইমাম সাহেব মাহমুদকে বললেন, 'মাহমুদ, উনার সাথে

খোশগল্প করার সময় নেই আমার হাতে। তুমি জলদি যাও, সেনা ফাঁড়ি থেকে সমস্ত সৈন্য নিয়ে দ্রুত চলে আসবে।'

তিনি ফাঁড়ির দূরত্ব, দিক এবং সংকেত বলে দিলেন। আর অন্য দু'জন গোয়েন্দার নাম ও ঠিকানা দিয়ে বললেন, 'এদেরকে এখুনি আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

এতক্ষণে রবার্টের টনক নড়লো। এরা কারা এবং কেন তাকে ধরে এনেছে বুঝতে আর কিছুই বাকী রইল না তার। তার সব জারিজুরি যে ফাঁস হয়ে গেছে এবং জীবনের অন্তিম লড়াই তার সামনে উপস্থিত, এ কথা মনে হতেই সে শিউরে উঠল।

মাহমুদ ইমাম সাহেবের ঘোড়ায় জিন এঁটে লাফিয়ে ঘোড়ায় চড়ল, বেরিয়ে গেল মসজিদের চত্বর থেকে। ইমাম সাহেবের সঙ্গী গোয়েন্দা দু'জনকে খুঁজে পেতে বেশীক্ষণ লাগল না। তাদেরকে মসজিদে যেতে বলে সে ফাঁড়ির উদ্দেশ্যে ঘোড়া ছুটালো।

তীব্র বেগে ঘোড়া ছুটিয়ে ঘন্টাখানেকের মধ্যেই ফাঁড়িতে পৌঁছে গেল সে। কিন্তু ওখানে পৌঁছেই তার মনে নতুন একটা সন্দেহ খচখচ করতে থাকল। একটু ইতস্ততের মধ্যে পড়ে গেল সে। ফাঁড়ির কমাণ্ডারকে সে ভাল করেই চিনতো। কমাণ্ডার যথেষ্ট নির্ভীক ছিল ঠিকই, কিন্তু সেই সাথে সে প্রচণ্ড রকম লোভীও ছিল।

সে শুনেছিল, সীমান্তের এ সব কমাণ্ডাররা খৃষ্টান ও সুদানীদের কাছ থেকে ঘুষ খেয়ে তাদের পক্ষে কাজ করে। কায়রো থেকেই তারা এ রিপোর্ট পেয়েছিল, কিন্তু এখন পর্যন্ত তার বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। মাহমুদের মনে

আশংকা জাগল, যদি সে বাহিনী না পাঠায়? কিংবা সময় নষ্ট করে শক্রদের জন্য সুযোগ করে দেয়? মাহমুদের আরও চিন্তা হল, যদি ফাঁড়ি থেকে সাহায্য না পাই, তখন কি করবো?

সকাল হওয়ার আগেই সেনা বাহিনী গ্রামে পৌছা দরকার। সেনা সাহায্য না পেলে ইমাম সাহেব ও সহকারী গোয়েন্দা দু'জনের বিপদ অনিবার্য। কারণ ছদ্মবেশী পীরের বহু মুরীদ রয়েছে সেখানে। তারা পীরের জন্য জান কবুল করতে দ্বিধা করবে না।

ইমাম খঞ্জর হাতে রবার্টকে পাহারা দিচ্ছিল। সাদিয়া একটা চেয়ারের ওপর বসেছিল চুপচাপ। এ সময় দরজায় নক হলো। সাদিয়া উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। কামরায় প্রবেশ করল গোয়েন্দা দু'জন। তারা উভয়েই সশস্ত্র।

কামরায় ঢুকেই তারা দেখতে পেল ইমাম সাহেব একজন লোককে বন্দী করে তাকে পাহারা দিচ্ছে। তারা ইমাম সাহেবের কাছে এগিয়ে গেল এবং বলল, 'কে এই বন্দী?'

ইমাম সাহেব তাদের কাছে সবকিছু খুলে বললেন। রবার্ট মুক্তির উপায় খুঁজছিল। সে আবারো মুক্তিপণের কথা তুলল। সে এতবেশি মুক্তিপণ আদায়ের আশ্বাস দিল, যা গোয়েন্দারা কল্পনাও করেনি।

ইমাম সাহেব বললেন, 'আমি আল্লাহর ঘর মসজিদে বসে আছি। এ ঘরের কসম, পৃথিবীর সব সম্পদ দিলেও আমি তোমাকে মুক্ত করার কথা চিন্তা করবো না। আমি আমার দেশ, জাতি ও ধর্মের সাথে বেঈমানী করতে পারবো না।

সালাহউদ্দিন আমাদের মনে দেশপ্রেমের যে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে, সে আগুন সব লোভ পুড়ে ছারখার করে দেয়। কোন মুসলমান হুশ থাকা পর্যন্ত তার ঈমান বিক্রি করতে রাজি হয় না। অতএব প্রলোভন দেখিয়ে তুমি আমাদের বিভ্রান্ত করতে পারবে না।'

গভীর রাত। মাহমুদ বিন আহমদ সেনা ফাঁড়িতে প্রবেশ করলো। তখনও কমাণ্ডারের কামরায় আলো দেখে অবাক হলো সে।

ঘোড়ার পায়ের শব্দ শুনে কমাণ্ডার বাইরে এলেন। মাহমুদ তার পরিচয় দিল এবং কমাণ্ডারের সাথে ভেতরে প্রবেশ করলো। মাহমুদ দেখলো, এ কমাণ্ডার নতুন এবং তার অচেনা।

মাহমুদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানালেন, গতকাল সন্ধ্যায় পুরাতন ব্যাচকে এখান থেকে বদলি করা হয়েছে। তার বদলে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়ুবী তাকে এ ফাঁড়ির দায়িত্বে নিয়োগ করেছেন। তিনি পুরাতন সমস্ত প্রহরীকে সীমান্ত থেকে সরিয়ে দিয়ে নতুন সৈন্য মোতায়েন করেছেন। এই সব সৈন্যরা ক্রাকের রণাঙ্গণ থেকে কায়রো এসেছিল এবং সেখান থেকে সুলতানের নির্দেশে সীমান্তের বিভিন্ন ফাঁড়িতে এসে দায়িত্ব বুঝে নিয়েছে।

মাহমুদ দ্রুত সব ঘটনা কমাণ্ডারকে খুলে বলল। কমাণ্ডার বললেন, 'তোমরা খুব বড় ধরনের শিকার ধরেছো।'

'হ্যা। কিন্তু পুরো দলকে ধরতে হলে ফাঁড়ির সমস্ত সৈন্য অবিলম্বে সেখানে পাঠাতে হবে। দলনেতা গ্রেফতার হয়েছে

জানতে পারলে ওরা মুহূর্তে পালিয়ে যাবে। এ জন্য ভোর হওয়ার আগেই সবকটা তাবুতে হানা দিতে হবে এবং তাদের গ্রেফতার করতে হবে।'

কমাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে ঘুমন্ত সৈনিকদের জাগিয়ে জলদি তৈরী হতে নির্দেশ দিলেন ; নিজেও চটজলদি পোশাক পাল্টে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। জনাপঞ্চাশেক সৈন্যের একটি বাহিনী নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন অভিযানে।

এসব সৈনিকরা সবাই তলোয়ার চালনা, বর্শা নিক্ষেপ ও তীরন্দাজীতে পারদর্শী। প্রয়োজনীয় অস্ত্রপাতি নিয়ে ওরা রওনা হয়ে গেল, ফাঁড়িতে মাত্র আট-দশজন সৈন্য পাহারায় রইল।

রাতের অন্ধকার চিরে কমাণ্ডারের নেতৃত্বে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে চললো পঞ্চাশজন সৈন্যের ক্ষুদ্র বাহিনী। তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে মাহমুদ। দুশমন যাতে টের না পায় এ জন্য গ্রামের কাছাকাছি গিয়ে তারা ঘোড়ার গতি কমিয়ে আনল।

তথাকথিত পীরের খাদেম ও ভক্তরা তখন ঘুমে বেহুশ। রাতের শানদার জলসার পর চলেছে শরাবের আসর। মদে মাতাল হয়ে ওরা যখন ঘুমিয়েছে তখন অনেক রাত।

তাবুর ভেতর অচেতন হয়ে ঘুমিয়েছিল ওরা। কমাণ্ডারের নির্দেশে সেনাবাহিনী ওদের তাবুগুলো এবং আশপাশের পুরো এলাকা ঘিরে ফেলল। কমাণ্ডারের কাছে ছুটি চাইল মাহমুদ, 'ইমাম সাহেবকে খবর দিতে হয়।'

'হ্যাঁ, তুমি জলদি উনাকে খবর দাও।'

ইমাম সাহেবকে অবরোধের খবর দেয়ার জন্য ছুটল

মাহমুদ। এখনো ফজরের আযান হয়নি। রাতভর ক্লান্তিহীন পরিশ্রমের কোন লেশ দেখা গেল না তার চেহারায়। ইমাম সাহেবের হুজরাখানায় পৌঁছে মাহমুদ দেখল তখনও সাদিয়া ওখানেই আছে। ঘুমে ঢুলুঢুলু দুই চোখ, চেহারায় ক্লান্তির বিমর্ষ ছাপ।

মাহমুদকে দেখেই তার ঘুম ছুটে গেল। সারা রাতের ক্লান্তি ঝেড়ে সতেজ কণ্ঠে বলে উঠল, 'তুমি ঠিক আছো মাহমুদ! কোন অসুবিধা হয়নি তো তোমার?'

মাহমুদ মৃদু হাসল। বলল, 'আল্লাহ মেহেরবান। তোমাদের দোয়ায় আমার অভিযান সফল হয়েছে। সেনাবাহিনী এই পাপিষ্ঠের সঙ্গী সাথীদের এখনি পাকড়াও করতে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই তারা সবকটা তাবু ঘিরে ফেলেছে। আমি অভিযানের শেষ পর্যন্ত না থেকে তোমাদের খবর দিতে ছুটে এসেছি।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ তোমাকে তোমার কষ্টের জাযা দিন। ভোর হয়ে এল প্রায়, এবার সাদিয়ার বাবাকে একটু ডেকে আনতে হয় যে!'

'জ্বি, আমি এখুনি যাচ্ছি।' মাহমুদ কালবিলম্ব না করে সাদিয়ার বাবার উদ্দেশ্যে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল।

ভণ্ড পীরের মুরীদান ও দূর দূরান্ত থেকে আগত দর্শকরা তার মোজেজা ও কেরামত দেখে মুগ্ধ, বিস্মিত, অভিভুত। পীর সাহেব বিদায় নেয়ার পর দীর্ঘক্ষণ তারা জিকির করে সময় কাটাল। তারপর এক সময় মুক্ত আকাশের নিচেই শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল ওরা।

আগামীকাল রাতে পীর সাহেব তাদের আশা-আকাংখা পূরণ করবেন এ ঘোষণা শোনার পর তারা আর বাড়ি ফিরতে চাইল না। শেষ রাতে ফজরের আযানের সময় হতেই ঘুম থেকে জেগে উঠলো ওরা। ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীর মন শান্ত, সমাহিত। শুয়ে শুয়েই চোখ মেলে তাকাল কেউ কেউ। কেউ বা উঠে বসে চোখ রগড়ে আবার তাকাল। আবছা আলোর মাঝে তারা দেখতে পেল অসংখ্য ঘোড়ার আদল দেখা যাচ্ছে চারপাশে। আর সেই সব ঘোড়ার আরোহীরা সবাই সৈনিকের মত টান টান হয়ে বসে আছে ঘোড়ার ওপর।

লোকজন ভাবল, এটাও হয়তো পীর সাহেবের নতুন কোন কেরামতি। এ অবস্থায় তারা কি করবে কিছুই বুঝে উঠতে পারল না। তারা ভাবল, হয়তো এখুনি তাদের করণীয় সম্পর্কে কোন ঘোষণা প্রচার করা হবে। এ অপেক্ষায় সবাই বসে রইল, কেউ জায়গা থেকে উঠে দাঁড়াল না। কারো কারো প্রাতঃক্রিয়ার প্রয়োজন দেখা দিল, কিন্তু তবু জায়গা থেকে উঠার সাহস হলো না কারো।

লোকজন একে অন্যকে খোঁচা মেরে ফিসফিস করে জানতে চাইল, 'এসব কি?'

পাশের জন ভয়ার্ত কণ্ঠে ফিসফিস করেই জবাব দিল, 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না! আমাদের কেউ কি কাল রাতে কোন বেয়াদবী করেছিল?'

'কই, পীর সাহেব যখন বিদায় নিলেন তখন তো তাকে অসন্তুষ্ট মনে হয়নি!'

কারো কারো বাইরে যাওয়ার বেগ বেশ বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেদিকেই তাকায় বিকটদর্শন ঘোড় সওয়ারদের মুখগুলো

ভেসে ওঠে চোখের সামনে। ডান, বাম, সামনে, পেছনে সবদিকে একই অবস্থা। কিছুই বুঝতে না পেরে লোকজন একে অন্যের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টি নিয়ে তাকাতে লাগল।

কিন্তু তখনো কেউ জানল না বা এ কথা চিন্তাও করলো না, যে কামেল পীর মৃতকে জীবিত করে দেখিয়েছে তাদের, বুকে খঞ্জর ও তীর মেরেও যাকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করা যায়নি, তিনি এখন হাত পা বাঁধা অবস্থায় মসজিদের এক হুজরাখনায় পড়ে আছেন। খোদার সাথে খাস সম্পর্কের দাবীদার ভণ্ড, প্রতারক পীর এখন খোদার সৈনিকদের হাতে বন্দী।

দামেশক শহরের এক সচ্ছল পরিবারের সন্তান কমাণ্ডার রুশদ বিন মুসলিম। জেহাদের ডাকে সাড়া দিয়ে সে সেনাবাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল। তার সাহস, প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেম যে কোন মুজাহিদের প্রেরণার উৎস হতে পারে। নিবেদিতপ্রাণ এ আল্লাহর সৈনিক অল্পদিনেই সালাহউদ্দিন আইয়ুবীর সুনজরে পড়ে যায়। তিনি খুব ভেবেচিন্তে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর দায়িত্ব এই সাহসী ও বিচক্ষণ যুবকের ওপর অর্পণ করলেন।

তাকে বিদায় দেয়ার সময় তিনি বললেন, 'রুশদ বিন মুসলিম! সমস্ত সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব নির্ভর করে সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সঠিক ও বলিষ্ঠ ভূমিকার ওপর। সারা দেশের মানুষ তোমাদের ওপর আস্থা রেখে নিশ্চিন্তে শান্তিতে ঘুমিয়ে থাকবে। তোমার সামান্য অসতর্কতা ও ঠিলেমি তাদের সব স্বপ্ন ও আশা আকাংখা ধুলিস্মাৎ করে দিতে পারে। ফলে

দায়িত্বের ব্যাপারে পূর্ণ সচেতন থাকবে। সব সময় চোখ কান খোলা রাখবে।

মনে রেখো, তোমার সাফল্য নির্ভর করবে তোমার বিচক্ষণতা, সাহস ও ক্ষিপ্রতার ওপর। আরো মনে রাখবে, সালাহউদ্দিন আইয়ুবী সবসময় তোমাদের সঙ্গে আছে। তার চর্ম চোখ সব সময় তোমাকে দেখতে না পেলেও তার অন্তর চোখ সর্বদা তোমাকে পাহারা দেবে। সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় মনে মনে ভাববে, আমিই সুলতান আইয়ুবী।'

কমাণ্ডারের চেতনায় সুলতানের এ বানী সারাক্ষণ জ্বলজ্বল করে জ্বলতো। তিনি তার সৈন্যদের বলেছিলেন, 'তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ঈমান বিক্রি করার দুঃসাহস ও বোকামী করো তবে তার পরিণতি ভোগ করার কথা মনে রেখেই করবে। কোন গাদ্দারের জন্য আমার দীলে বিন্দুমাত্র রহম নেই। আমি তাকে হাত পা বেঁধে মরুভূমির মাঝে জীবন্ত পুতে রাখবো। কোন বিশ্বাসঘাতকের শাস্তি নির্ধারণের জন্য আমি কায়রোর আদেশের অপেক্ষা করবো না। আল্লাহর আইনই আমার জন্য যথেষ্ট।'

একটু পরই সকাল হলো। আবছা আঁধার কেটে স্পষ্ট হলো সবকিছু। রুশদ বিন মুসলিমের দৃষ্টি তাবুর দিকে। সেখানে কোন প্রকার সাড়া শব্দের আভাস পর্যন্ত নেই। তাবুর বাসিন্দারা এত সকালে জাগার লোক নয়, বরং ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস তাদের ঘুমকে আরো গাঢ় ও মধুর করে তুলেছে।

রুশদ বিন মুসলিম জনসাধারণকে এক দিকে সরিয়ে নিলেন। কেউ যেন পালাতে না পারে এ জন্য কয়েকজনকে

লাগিয়ে দিলেন পাহারায়। বললেন, 'এদের প্রাতঃক্রিয়া ও নামাজের সুযোগ দেবে, কিন্তু খেয়াল রাখবে, কেউ যেন পালিয়ে যেতে না পারে।'

রুশদ বিন মুসলিমের বিচক্ষণতা বলছিল, যদি এই সরল লোকগুলোর সামনে ভণ্ডপীরের মুখোশ উন্মোচন করা না হয়, তবে চিরকালই এই লোকগুলো বিভ্রান্তির মাঝে ডুবে থাকবে। সত্য ওদের কাছে থাকবে মিথ্যা হয়ে আর মিথ্যা বেঁচে থাকবে সত্যের মত। যতক্ষণ এই মুখোশ উন্মোচনের কাজ শেষ না হবে ততক্ষণ কাউকে এখান থেকে যেতে দেয়া যাবে না।

কোন অপরাধী যাতে পালিয়ে যেতে না পারে এ জন্য কমাণ্ডার বিভিন্ন টিলার ওপরে তিন চারজন করে সৈন্য মোতায়েন করলেন। অবশিষ্ট সৈন্যদের ভাগ করলেন দুটি দলে। একদল অস্ত্র তাক করে অশ্বপৃষ্ঠে বসে রইল, অন্য দলকে হুকুম দেয়া হলো চারদিক থেকে পায়ে হেঁটে তাবুর মধ্যে প্রবেশ করার।

কমাণ্ডার তাদের বললেন, 'যদি কেউ বাঁধা দেয় বা পালিয়ে যেতে চায় তবে তাকে হত্যা করবে, আর আত্মসমর্পন করলে বন্দী করবে তাকে।'

বাহিনী খোলা তলোয়ার হাতে তাবুর মধ্যে প্রবেশ করল। একটি তাবুতে ঢুকলেন রুশদ বিন মুসলিম। দেখলেন একটি অর্ধ উলঙ্গ মেয়ে এবং দু'জন লোক গভীর নিদ্রায় মগ্ন। তিনি তলোয়ারের মাথা দিয়ে খোঁচা মেরে জাগাতে চাইলেন ওদের। কিন্তু তারা জাগার পরিবর্তে অসহিষ্ণু কণ্ঠে গালি দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

তিনি তলোয়ারের খোঁচা একটু জোড়ালো করলেন। যখন তলোয়ারের মাথা চামড়া কেটে ভেতরে প্রবেশ করলো, তখন চরম বিরক্তি নিয়ে চোখ মেলে চাইল এবং চোখের সামনে অস্ত্রধারী আগন্তুককে দেখে ভয়ে বিবর্ণ হয়ে গেল ওদের চেহারা। রুশদ বিন মুসলিম তিনজনকেই উঠে বসতে ইঙ্গিত করলে আতংকে হুড়মুড় করে উঠে বসলো ওরা। কেউ কোন রকম প্রতিরোধ বা প্রতিবাদ না করে নিঃশব্দে হুকুম তামিল করে কমাণ্ডারের সাথে বাইরে বেরিয়ে এলো।

অন্যান্য তাবুতেও প্রায় অনুরূপ ঘটনাই ঘটল। প্রতিটি তাবুতেই নগ্ন ও অর্ধনগ্ন মেয়ে পুরুষকে বেহাল অবস্থায় পাওয়া গেল। তাবুর মধ্যে যেসব জিনিসপত্র পাওয়া গেল তার মধ্যে বাজনার সাজ-সরঞ্জামই বেশি।

সবাইকে বাইরে নিয়ে আসা হলো। কমাণ্ডার নির্দেশ দিলেন, 'পিছমোড়া করে হাত বাঁধো সবার। একেক রশিতে দশজন করে আটকাবে। প্রতিটি দলের পেছনে সেই রশির এক মাথা থাকবে আমাদের কোন সৈনিকের হাতে।'

নির্দেশমত বেঁধে ফেলা হলো ভণ্ডপীরের সঙ্গী সাথীদের। এ অভিযানে রুশদ বিন মুসলিম দুশমনের উট, ঘোড়া, বহু সৌখিন মালামাল এবং পাহারাদারদের অস্ত্রশস্ত্র সবই অক্ষত অবস্থায় দখল করার সুযোগ পেলেন।

একটু পরই মাহমুদ সাদিয়ার পিতাকে নিয়ে ফিরে এল। সাদিয়াকে তার বাপের হাতে তুলে দিয়ে ইমাম সাহেব মাহমুদকে বললেন, 'মাহমুদ, আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করা ঠিক নয়। বন্দীকে নিয়ে চলো ঘটনাস্থলে যাই।'

তারা ভণ্ডপীরকে নিয়ে সেই প্রান্তরে চলে এল। রুশদ বিন মুসলিম ইমাম সাহেবের সাথে কোলাকুলি করে বললেন, 'গতরাতে এই প্রতারক সরলপ্রাণ মুসলমানদের কিভাবে বিভ্রান্ত করেছে এবার তা প্রকাশ করার সময় হয়েছে। ওকে এখানে নিয়ে এসে ভালই করেছেন।'

মিথ্যা পীরের দাবীদার রবার্টের দু'হাত পিছমোড়া করে বাঁধা ছিল। যে মঞ্চে গতরাতে সে ভেলকিবাজি দেখিয়েছিল তাকে সেখানে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো। পিছনে তখনও সেই তারাখচিত পর্দা লাগানো। তার সঙ্গী সাথীদেরকে মঞ্চের সামনে বসিয়ে দেয়া হলো। এদের সকলের হাতই পিছনে বাঁধা। বাদ্যযন্ত্রগুলো, যেগুলো একটু আগে তাবু থেকে উদ্ধার করা হয়েছে সেগুলোও রাখা হলো তাদের পাশে।

সাদিয়া ও সাদিয়ার বাপ গ্রামে ফিরে গাঁয়ের লোকদের ডেকে ডেকে বলতে লাগল, 'কে কোথায় আছো, জলদি চলো, পীরের উপত্যকায় ভয়ানক নাটক হচ্ছে। দেরী করলে সে নাটক আর দেখতে পাবে না।'

লোকজন ওদের ডাক চিৎকারে ছুটে এল এবং সকালের কাজকর্ম ফেলে রেখেই ছুটল রহস্যাবৃত প্রান্তরের দিকে। তারা গিয়ে দেখল, ইমাম সাহেব সবাইকে ডেকে মঞ্চের সামনে বসিয়ে দিচ্ছে।

গতরাতে এই সব লোক যেখানে বসেছিল ইমাম সাহেব তাদেরকে ডেকে এনে সেখানেই বসাল। আতংকিত জনগণ ভয়ে ভয়ে সেখানে এসে চুপচাপ বসে পড়ল। তাদের দেখাদেখি গাঁয়ের লোকেরাও এসে বসল সেখানে।

ইমাম সাহেব তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'উপস্থিত সরলপ্রাণ মুসলমান ভাইয়েরা, এই ব্যক্তি গতরাতে তোমাদের কাছে নিজেকে খোদার দূত বলে দাবী করেছিল। সে মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করাসহ নানা কেরামতি দেখিয়েছে তোমাদের। নানা অসাধ্য সাধন করতে পারে বলে তোমাদের বুঝিয়েছে। এখন তাকে বলো, সে যেন তার কেরামতির সাহায্যে দড়ির বন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে।'

ইমাম সাহেব আরো বললেন, 'আমি এখন তার দলের একজনকে হত্যা করবো। একে তোমরা বলো, পারলে সে আমার হাত থেকে তার সাথীকে ছাড়িয়ে নিক। আর তা যদি না পারে হত্যা করার 'পর যেন সে ওকে আবার জিন্দা করে দেয়।'

ইমাম সাহেব ভণ্ড পীরের এক খাদেমকে দল থেকে আলাদা করে মঞ্চে নিয়ে এলেন। মাহমুদ তলোয়ার নিয়ে অগ্রসর হলো তাকে হত্যা করতে।

লোকটি চিৎকার দিয়ে বললো, 'আমাকে ক্ষমা করুন। দোহাই খোদার, আমাকে মারবেন না। এ লোক মৃতকে জীবিত করতে পারে না। সব ভাওতাবাজি, সব প্রতারণা। এ লোক আমাদের মতই সাধারণ মানুষ, খোদার দূত হওয়ার দাবী মিথ্যা ও বানোয়াট। আমাকে হত্যা করলে আমি স্রেফ খুন হয়ে যাবো। কোনদিন সে আমাকে জীবিত করতে পারবে না, বিশ্বাস না হয় এ কথা তোমরা তাকেই জিজ্ঞেস করে দেখো।'

জনসাধারণ লোকটার ব্যাকুল কণ্ঠের চিৎকার ধ্বনি শুনল, কিন্তু তবু তাদের সন্দেহ দূর হলো না। ইমাম সাহেব

ভণ্ডপীরের আলখেল্লা, কাপড় চোপড় এবং চামড়ার গায়ে শোলা বসিয়ে তৈরী করা বক্ষ বন্ধনীও সাথে করে নিয়ে এসেছিলেন। তিনি মঞ্চের পিছনে গিয়ে এই পোষাক পরে নিলেন। কাউকে না দেখিয়ে শোলা কাঠের বক্ষ বন্ধনীও পরলেন এবং তার ওপর আলখেল্লা জড়িয়ে আবার মঞ্চে এলেন।

মঞ্চে এসে উপস্থিত জনতাকে তিনি বললেন, 'এই লোক তোমাদের খেলা দেখাতো রাতের আঁধারে। এখন আমি সেই খেলাই দেখাবো এই উজ্জ্বল দিনের আলোয়।'

তিনি চারজন তীরন্দাজকে ডাকলেন এবং বললেন, 'ত্রিশ কদম দূরে দাঁড়িয়ে আমার বুকে তীর চালাও।'

তীরন্দাজরা অনুমতির জন্য রুশদ বিন মুসলিমের দিকে তাকালো। রাতে মাহমুদ রুশদকে তীর ও খঞ্জর চালানোর ঘটনা বলেছিল। রুশদ ইশারায় তাদের তীর চালাতে আদেশ দিলেন।

তারা ইমামের বুকে নিশানা করে তীর চালালো। চারটি তীরই ইমামের বুকের মাঝখানে বিদ্ধ হয়ে গেল। ইমাম সাহেব বিন্দুমাত্র বিচলিত হলেন না, বরং হাসি মুখে তাদের বললেন, 'এবার সামনে এগিয়ে এসে আমার বুকে ছুরি চালাও।'

ওরা এগিয়ে এসে ইমাম সাহেবের বুকে ছুরি চালালো। ছুরি গেঁথে রইল ইমামের বুকে, কিন্তু তিনি আগের মতই হাসি মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

উপস্থিত জনতা রুদ্ধশ্বাসে এ ঘটনা দেখছিল। যখন তীর ও খঞ্জর চালানো হয় তখন তারা ভয়ে চোখ বন্ধ করে

ফেলেছিল। কিন্তু এতে ইমাম সাহেবের কিছু হয়নি দেখে তারা যারপরনাই বিস্মিত হলো।

ইমাম সাহেব এবার তীরন্দাজদের উদ্দেশ্য করে বললেন, 'তোমরা তীর ধনুক রেখে আমার পাশে এসে দাঁড়াও।'

তারা মঞ্চে উঠে এলে তিনি রহস্যময় লোককে দেখিয়ে উচ্চস্বরে বললেন, 'এই লোক নিজেকে অমর বলে দাবী করেছিল। আমি এবার আপনাদেরকে তার অমরত্বের রহস্য দেখাবো।'

তিনি তীরন্দাজদের দিকে ফিরে বললেন, 'তোমরা মঞ্চের এক কোণে সরে যাও এবং ওখান থেকে তার বুকে তীরের নিশানা করো।'

তীরন্দাজরা মঞ্চের এক পাশে সরে গিয়ে ধনুকে তীর জুড়ল। লোকটি এ দৃশ্য দেখে ছুটে এসে ইমামের পিছনে পালিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে দিল। মৃত্যু ভয়ে তখন সে থরথর করে কাঁপছিল আর ইমাম সাহেবের পা জড়িয়ে ধরে ভিক্ষুকের মত প্রাণ ভিক্ষা করছিল।

ইমাম সাহেব তাকে বললেন, 'সামনে এসো, লোকজনের কাছে তোমার আসল পরিচয় বলো। তুমি যে খৃস্টানদের লেলিয়ে দেয়া এক ধোকাবাজ এ কথা সবাইকে জানিয়ে দাও।'

লোকটি করুণ চোখে চাইল ইমামের দিকে। সেখানে দয়ামায়ার কোন চিহ্ন নেই। ইমাম সাহেব ধমকে উঠলেন, 'উঠো, দাঁড়াও। জনতার সামনে তোমার আসল পরিচয় বলে দাও।'

লোকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দু'কদম হেঁটে মঞ্চের

মাঝখানে জনতার দিকে মুখ করে দাঁড়াল। বললো, 'হে প্রতারিত জনগণ! আমি স্বীকার করছি আমি অমর নই। আমি তোমাদের মতই একজন সাধারণ মানুষ। আমি খৃস্টান, আমার নাম জেমস রবার্ট। মুসলমানদের সাথে খৃস্টানদের যে ক্রুসেড চলছে আমি তার একজন যোদ্ধা। আমার জাতি তোমাদেরকে পরাজিত ও বিভ্রান্ত করার জন্য আমাকে পাঠিয়েছে। আমি যা করেছি, আমার জাতির স্বার্থে করেছি। তোমাদের ঈমান কিনে তোমাদের পরাজিত করার জন্য করেছি।

আমি জানি, আমি যখন ধরা পড়েছি তখন আমার মৃত্যু অবধারিত। এ জন্য আমার কোন আফসোস নই। আমার জাতি যুগে যুগে তোমাদের বিভ্রান্ত করার জন্য, তোমাদের ঈমান ক্রয়ের জন্য আমার মত হাজারো যুবককে পাঠাবে। কখনো আমরা নিজেরা এ কাজ করবো, কখনো তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে কিনে নেবো এ কাজ করার জন্য। যতদিন আমরা বিজয়ী না হবো ততদিন এ ক্রুসেড অব্যাহত থাকবে। কতজনকে ধরবে তোমরা, কতজনকে হত্যা করবে?'

রবার্ট তার বক্তৃতা শেষ করে ইমাম সাহেবের দিকে ফিরে বলল, 'আমার যা বলার আমি বলেছি। এবার তুমি যেখানে খুশি আমাকে নিয়ে যেতে পারো।'

ইমাম সাহেব বললেন, 'দাঁড়াও। আগে আমার কথা শেষ করতে দাও, তারপর তোমার ব্যাপারে ফয়সালা করা যাবে।'

তিনি উপস্থিত লোকজনদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই লোকই সামাউনের কন্যা সাদিয়াকে কিডন্যাপ করেছিল। গতরাতে আমি তাকে উদ্ধার করেছি।'

তিনি শরীর থেকে আলখেল্লা খুলে ফেললেন। এরপর খোললেন আলখেল্লার নিচে পরা কাপড় চোপর। সব শেষে জামা কাপড়ের নিচে পরা শোলা কাঠের নরম বক্ষ আবরণী খুলে এক লোকের হাতে দিয়ে বললেন, 'এটা সমস্ত দর্শকের সামনে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাও। সব তীর ও ছুরি এই নরম কাঠে বিদ্ধ হতো।'

লোকজনের সামনে পীরের সব রহস্য ও জারিজুরি ফাঁস হয়ে গেল। তিনি দর্শকদেরকে পর্দার পিছনে নিয়ে গিয়ে সেই গর্ত দেখালেন, যেখানে বসে রাতে রাজনাদাররা সুরের ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করে বিমোহিত করতো মানুষকে।

তাবুর এলাকায় যাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ তুলে নেয়ার ফলে লোকজন কৌতুহলী হয়ে ওখানে গেল। এলাকাটা শরাবের দুর্গন্ধে ভরা। দর্শকরা তাবুগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল। এ সময় ইমাম সাহেব আবার তাদের ডাকলেন। লোকজন বসলে তিনি তাদের বললেন, 'কাল রাতের আরো একটি তামাশার কাহিনী শোন।'

তিনি বন্দীদের মধ্যে সেই লোকটিকে চিনতে পেরেছিলেন, যাকে কাল রাতে মৃত বলে দেখানো হয়েছিল। লোকটি রশি বাঁধা অবস্থায় কয়েদীদের মধ্যে বসেছিল। ইমাম সাহেব তাকে কাছে ডাকলেন।

যে ব্যক্তি বৃদ্ধ বাবা সেজেছিল তাকেও ডাকলেন। এরপর ডাকলেন ঐ চারজন তীরন্দাজকে যারা রাতে তীর চালিয়েছিল। তারপর তারাই উপস্থিত লোকজনকে রাতে তারা কিভাবে কি করেছিল সব কথা খুলে বলল। পীর সাহেব সম্পর্কে জনগণের সব সন্দেহ দূর হয়ে গেল।

ঈমাম সাহেব সমবেত জনগণকে উদ্দেশ্যে করে বললেন, 'হে মুসলিম জাতি! এটা কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। ক্রুসেডাররা মুসলমানদের ঈমান নষ্ট করার জন্য যে সর্বগ্রাসী পরিকল্পনা নিয়েছে এটা তারই অংশ মাত্র। এ কথা সবারই জানা, কোন মানুষই মৃত মানুষকে জীবিত করতে পারে না। স্বয়ং আল্লাহও কোন মৃতকে জীবিত করেন না, কারণ আল্লাহ শানুহু তার বানানো আইন-কানুন মেনে চলেন। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, তাঁর কোনই শরীক নেই। খৃস্টানরা আল্লাহর এই একত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের বানীকে স্তব্ধ করতে এই সব অপকৌশল ব্যবহার করছে।

ওরা মুসলমানের ঈমানী শক্তি ও জেহাদী জযবা দেখে ভয় পায়। মুসলমানদের সাথে যুদ্ধের ময়দানে মোকাবেলা করতে ব্যর্থ হয়ে তারা এ ষড়যন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। তাদের মিষ্টি কথা ও মন ভুলানো কার্যক্রমের উদ্দেশ্য তোমাদের বিভ্রান্ত করা। তোমাদের মনে সন্দেহ ও ধোঁকার বীজ বপণ করে জেহাদের ময়দান থেকে সরিয়ে রাখা।

এই মিশরেই একদিন ফেরাউন নিজেকে খোদা বলে দাবী করেছিল। এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন হযরত মূসা (আ.)। ফলে আল্লাহ ইসলামের দুশমন ফেরাউনকে নীল নদে ডুবিয়ে মেরেছে। হে আমার প্রিয় বন্ধুগণ! আজ যদি তোমরা দ্বীন ও ঈমানের স্বপক্ষে মুসা (আ.) ও তাঁর অনুসারীদের মত দৃঢ় পায়ে দাঁড়াতে পারো তবে এই সব ভণ্ড ও প্রতারকদের ঠিকানাও হবে নীল নদ।'

উপস্থিত মুসলমানদের মনে জ্বলে উঠলো ঈমানী জোশ

ও জযবা। ইসলাম সম্পর্কে সঠিক ধারনার অভাবে তারা যতই নফসের গোলামী করুক, দ্বীনের জন্য জীবন বিলিয়ে দেয়ার ডাক এলে তারা সেই ডাকে সাড়া দিতে কখনো দেরী করেনি।

ধোকাবাজদের মুখোশ খুলে যেতেই সমবেত জনতা উত্তেজিত হয়ে উঠল। যারা তাদের ধোকা দিয়ে ঈমানের পথ থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছিল তাদের খতম করার জন্য উত্তেজিত জনতার রক্ত টগবগ করে উঠল।

গ্রামের এক যুবক উঠে দাঁড়াল। উপস্থিত জনগণকে সম্বোধন করে সে বলল, 'ভাইসব, যারা ধোকা দিয়ে আমাদেরকে দ্বীনের পথ থেকে সরিয়ে রেখেছিল তারা ক্ষমার অযোগ্য। তাদের কাজ তারা করেছে, এবার আমাদের পালা। বেঁচে থাকলে আবারও ওরা আমাদের মত সরলপ্রাণ মুসলমানকে বিভ্রান্ত করবে। সে সুযোগ আর আমরা ওদের দেবো না।'

সে আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু উত্তেজিত জনতার গগনবিদারী শ্লোগানের নীচে চাপা পড়ে গেল তার কণ্ঠ। 'নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে ক্ষিপ্ত জনতা ভণ্ড পীর ও তার দলের লোকদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

রুশদ বিন মুসলিম এই বন্দীদের কায়রো নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এতবড় ক্ষিপ্ত জনতার হাত থেকে তাদের উদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে উঠল। তিনি জনগণকে বুঝাতে গিয়ে ব্যর্থ হয়ে শেষে জনতার ওপর লাঠিচার্জ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাতে জনতার ক্ষোভ আরো বেড়ে গেল।

অবস্থা নিয়ন্ত্রণের বাইরে বুঝতে পেরে ইমাম সাহেব বললেন, 'রুশদ! লাঠি চার্জ করে এই উত্তেজিত জনতাকে তুমি কিছুতেই ফিরাতে পারবে না। তোমার লাঠির আঘাতে ওরা আহত হবে, রক্তাক্ত হবে, কিন্তু তাতে তাদের ক্ষোভ ও ক্রোধ আরো বেড়ে যাবে। এতদিন যাকে ওরা খোদার দূত বলে ভক্তি করে এসেছে সেই পাপিষ্ঠের মরণ যদি আল্লাহ ওদের হাতেই লেখে থাকেন, তুমি তা ফেরাতে পারবে না।'

বন্দীদেরকে বিক্ষুব্ধ জনতার হাতে ছেড়ে দিয়ে ইমাম সাহেব ও রুশদ বিন মুসলিম একদিকে সরে গেলেন। রুশদ এক টিলার ওপর দাঁড়িয়ে সৈন্যদের বললেন, 'এই জনতাকে তোমরা আর তাদের ঈমানের দাবী পূরণে বাধা দিও না।'

কিছুক্ষণ পরের কথা। ময়দানে সেনাবাহিনী, ইমাম সাহেব, কমাণ্ডার রুশদ ও মাহমুদ ছাড়া আর কেউ নেই। জনগণ তাদের ঈমানের ওপর আঘাতকারীদের পাওনা মিটিয়ে দিয়ে সরে পড়েছে সেখান থেকে। যাওয়ার আগে তাদের তাবু, পর্দার কাপড় ও অন্যান্য যা কিছু হাতের কাছে পেয়েছে সব একত্রিত করে তাতে আগুন ধরিয়ে পুড়ে ছাই করে দিয়েছে।

গত রাতে যেখানে তামাশা দেখিয়েছিল রবার্ট ও তার লোকেরা, সেখানেই পড়েছিল ওদের লাশগুলো। মনে হচ্ছিল, হঠাৎ কোন ঝড় এসে সবকিছু তছনছ করে দিয়ে গেছে।

'এখন আমাদের কায়রো যেতে হবে।' ইমাম সাহেব রুশদ ও মাহমুদকে বললেন, 'এই ঘটনা অবিলম্বে রিপোর্ট করতে হবে সরকারের কাছে।'

অন্তহীন ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটছে সালাহউদ্দিন

আইয়ুবীর। গাদ্দারদের গ্রেফতার ও ধর্মীয় ফেতনা সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার পর তিনি দৃষ্টি দিলেন সামাজিক অনাচার ও বেহায়াপনা নির্মূলের দিকে। তিনি এমন সব খেল তামাশা ও অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন যার মধ্যে যৌনতা ও জুয়া জড়িত। মদ এবং নেশা জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার নিষিদ্ধ করলেন। গোয়েন্দা প্রধান আলীকে বললেন, 'যেখানে যত মদের আখড়া পাও, গুড়িয়ে দাও।'

সুলতানের আদেশ পেয়ে আলী বিন সুফিয়ান ও তার গোয়েন্দা বাহিনী চিত্ত বিনোদনের সেই সব কেন্দ্রগুলোতে হামলা চালালো, প্রদর্শনীর নামে যেখানে অবাধ যৌনতার হাট বসেছিল। তারা স্পেনের খৃস্টান শিল্পীদের তৈরী উলঙ্গ তৈলচিত্রগুলো আটক করলো। এর সাথে জড়িত দুস্কৃতকারীদের গ্রেফতার করলো।

এসব অপরাধ দমনে আলীকে পূর্ণ এখতিয়ার ও দায়িত্ব দিয়ে সুলতান আইয়ুবী এবার গ্রেফতারকৃতদের বিচারের দিকে মনযোগ দিলেন। যাদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহীতার অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলো অপরাধের প্রকৃতি অনুযায়ী তাদেরকে বিভিন্ন মেয়াদী কারাদণ্ড দেয়া হলো। গুরুতর অপরাধীদের দেয়া হলো যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।

সুলতান আইয়ুবী মানুষের বিনোদনের বিরোধী ছিলেন না। অশ্লীল বিনোদনের মোকাবেলায় সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা করলেন তিনি। মহল্লায় মহল্লায় তলোয়ারবাজী, তীরন্দাজী, ঘোড় সওয়ারী, কুস্তি ও পাঞ্জা লড়াই এসব খেলার জন্য বিভিন্ন ক্লাব গড়ে তোললেন। মসজিদ ও মাদ্রাসায় কেরাত, হামদ, নাত ও আযান প্রতিযোগিতার আয়োজন করলেন। সরকারী

পৃষ্ঠপোষকতা ও ব্যবস্থাপনায় ধর্মীয় জলসা এবং ইসলামী কবিতা পাঠের আসর ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করলেন।

খেলাধুলাসহ সকল প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের জন্য আকর্ষণীয় পুরস্কারের ব্যবস্থা করলেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেলোয়ারদের দেয়া হতো উন্নত জাতের ঘোড়া ও অস্ত্র। অন্যান্য বিজয়ীরা পেতো মূল্যবান কিতাবাদি।

সীমান্ত এলাকা। এখানেও এসে লাগল সেই প্রতিযোগিতার ঢেউ। সুলতান প্রশাসনকে হুকুম করলেন, 'শহর ও রাজধানী শুধু নয়, প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও এই প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দাও।'

সুলতান এই গ্রামের লোকদের নিয়েই বেশি দুশ্চিন্তায় ছিলেন। তিনি জানতেন, গ্রামের এই সব অশিক্ষিত লোকরাই প্রথম শত্রুদের আক্রমণের শিকার হয়। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকার লোকদেরই তারা প্রথম টার্গেট করে। তাই এদের নিরাপত্তার জন্য তিনি বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

তিনি নতুন করে সীমান্তে যে বাহিনী পাঠালেন তাদের কমাণ্ডারকে এ ব্যাপারে নজর দিতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিলেন। সমস্ত সৈন্যদের মধ্য থেকে এসব কমাণ্ডারদের তিনি বিশেষভাবে বাছাই করেছিলেন।

রুশদ বিন মুসলিম ছিলেন সেই বাছাইকৃতদের একজন। মাহমুদের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়ামাত্র তিনি দুষ্কৃতকারীদের ধ্বংসের জন্য সীমান্তের ফাঁড়ি থেকে সৈন্য নিয়ে ছুটে গিয়েছিলেন সেখানে। যদি রুশদ না হয়ে পুরোনো কমাণ্ডার

থাকতো সে ফাঁড়িতে, তবে দেখা যেতো সুদানী ও খৃস্টানদের দেয়া শরাবে মাতাল কমাণ্ডারের হুশ ফিরাতেই দিন কাবার হয়ে গেছে তার। ততক্ষণে দুষ্কৃতকারীরা সারা গ্রাম ছারখার করে পালিয়ে গেছে।

কায়রো। আলী বিন সুফিয়ানের কামরায় বসে আছেন কমাণ্ডার রুশদ বিন মুসলিম, মাহমুদ বিন আহমদ ও ইমাম ইউসুফ বিন বাজ। তারা আলী বিন সুফিয়ানকে শোনাচ্ছিলেন সেই রহস্যময় পীরের কাহিনী, যাদেরকে ক্ষুব্ধ জনতা হত্যা করেছিল।

তিনি ওদের কাছ থেকে সমস্ত কাহিনী শুনে তাদের নিয়ে গেলেন সুলতান আইয়ুবীর কামরায়। সুলতান আইয়ুবী সব কাহিনী শুনে খুশি হয়ে বললেন, 'আল্লাহ এই জাতির ওপর রহমত নাজিল করুন। এক ভয়াবহ ফেতনার হাত থেকে জাতিকে বাঁচিয়েছো তোমরা।'

আলী বিন সুফিয়ান বললেন, 'ফেতনার মূল উপড়ে ফেলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তার জের এখনো শেষ হয়নি। এখনো ওইসব এলাকা থেকে সেনাবাহিনীতে লোক ভর্তি হওয়া শুরু হয়নি।'

'জ্বী।' ইমাম সাহেব বললেন, 'সীমান্তের লোকেরা অধিকাংশই এখনো সুদানীদের বন্ধু। তারা মিশর সরকারের প্রতি আস্থাশীল নয়। দুশমনের ক্রমাগত মিথ্যা প্রচারণা ও নানা রকম ফেতনা তাদের অন্তর থেকে জিহাদের প্রেরণা নিঃশেষ করে দিয়েছে।'

সুলতান প্রশ্ন করলেন, 'তারা কি এখনো তাদের ফসল ও

পশু আমাদের না দিয়ে খুশি মনে সুদানীদের দিয়ে দিচ্ছে?'

ইমাম সাহেব বললেন, 'হ্যা, সীমান্ত এলাকায় ইসলামী চেতনা লোপ পেয়েছে। সেখানকার মসজিদগুলো এখন বিরান। লোকেরা পীর পূজা, ব্যক্তি পূজা ও নানা তন্ত্রে মন্ত্রে বিশ্বাসী হয়ে গেছে। এই লোকদের সঠিক পথে ফিরে আনার জন্য আমাদের মিশনারী তৎপরতা শুরু করা দরকার। যদি উন্মত্ত জনতা এই পীরকে হত্যা না করতো তবে তাকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মানুষের বিভ্রান্তি আরো কিছুটা দূর করা যেতো।'

একদল মোবাল্লিগকে সীমান্তবর্তী এলাকায় পাঠিয়ে সুলতান আইয়ুবী এবার মনযোগ দিলেন তকিউদ্দিনের দিকে। চোখ কান খোলা রেখে প্রতিটি মুহূর্ত ব্যয় করতে লাগলেন তিনি। রাতের ঘুম পর্যন্ত হারাম করে দিলেন।

কিন্তু তকিউদ্দিনকে সুদান থেকে বের করে আনা কোন সহজ ব্যাপার ছিল না। মিশরের আভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রতি মুহূর্তে সুলতানের উপস্থিতি দাবী করছে। অসংখ্য জটিলতার গিট খোলায় ব্যস্ত তিনি। কোথাও একটু ভুল করলে, সামান্য একটু ফুটো পেলে যে কোন সময় দাবার ছক উল্টে যাওয়ার মত অবস্থা হতে পারে। এ অবস্থায় তিনি নিজে কিছুতেই সুদানের রণাঙ্গণে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে পারছেন না।

তিনি কায়রো এসেই তকিউদ্দিনকে জানিয়েছিলেন এ খবর। সেই কাসেদ খবর দিয়ে ফিরে এসেছে। তার কাছ থেকেই সুলতান জানতে পেরেছেন তকিউদ্দিনের বাহিনীর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির কথা। তার সৈন্যরা এখনও ছত্রভঙ্গ। কিছু সৈন্য যুদ্ধের সঙ্গীন অবস্থা দেখে ভয়ে পালিয়ে গেছে।

কাসেদ বলেছে, তকিউদ্দিন তাঁর অবশিষ্ট সৈন্যদের ঐক্যবদ্ধ করতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন কিন্তু শত্রুরা তাদের ঘাড়ের ওপর চেপে আছে। দুশমনের আঘাতের বিরুদ্ধে পাল্টা আঘাত হানার কোন সামর্থ নেই তকিউদ্দিনের। তার এতটুকুই সাহায্য প্রয়োজন, যেন তিনি শত্রুদের ওপর আঘাত হেনে নিজের সৈন্যদের ফিরিয়ে আনতে পারেন।

সুলতান সালাহউদ্দিন তড়িঘড়ি তিন চারটি ছোট ছোট কমাণ্ডো গ্রুপ ও একটি ক্ষুদ্র বাহিনী পাঠিয়ে দিলেন তকিউদ্দিনের সাহায্যে। তিনি তাদের বললেন, 'তকিউদ্দিনের কাছে রিপোর্ট করে তোমরা স্বাধীনভাবে কাজ করবে। তোমাদের কাজ হবে সুদানী বাহিনীকে যত্রতত্র পাল্টা আক্রমণ করে ব্যতিব্যস্ত রাখা।'

রাতের আঁধারে তারা সুদানে প্রবেশ করল। তকিউদ্দিনের কাছে রিপোর্ট করে সরে পড়ল ওখান থেকে। এরপর চলে গেল সুদানী বাহিনীর পেছনে। বিভিন্ন গ্রুপ বিভিন্ন দিক থেকে একযোগে তীব্র আক্রমণ চালালো। অসম্ভব দ্রুত গতিতে জায়গা বদল করে আক্রমণ অব্যাহত রাখায় শত্রুদের মধ্যে ভীতি ছড়িয়ে পড়ল। ক্রাকের রণাঙ্গণ থেকে আইয়ুবী ফিরে এসেছে এ খবর তারা আগেই পেয়েছিল।

তাদের ধারনা হলো, তকিউদ্দিনের সাহায্যে আইয়ুবী তার বাহিনী নিয়ে ছুটে এসেছে। এ হামলা তারাই চালিয়েছে। ভয়ে তারা লড়াইয়ের ধারা পাল্টে ফেলল। আইয়ুবী কত সৈন্য নিয়ে ময়দানে এসেছে এ ব্যাপারে কোন ধারনা না থাকায় তারা পিছু হটা শুরু করল। কমাণ্ডো বাহিনী যুদ্ধের ধারা

বুঝতে পেরে আক্রমণ আরো তীব্রতর করল। ভীত সন্ত্রস্ত সুদানী বাহিনীর বিপুল সংখ্যক সৈন্য প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে রণে ভঙ্গ দিয়ে এদিক ওদিক সরে পড়ল।

কমাণ্ডো বাহিনীর উদ্দেশ্য ছিল, শত্রুদের ভীত সন্ত্রস্ত্র করে তকিউদ্দিনের সরে পড়ার পথ উন্মুক্ত করা। তকিউদ্দিনের সাথে দেখা করে তারা বলেছিল, 'শত্রুদের চাপ কমে এলে আপনাদের কাজ একটাই, আস্তে আস্তে পেছনে সরে যাওয়া। খবরদার, অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করবেন না, আবার স্থবির হয়ে বসেও থাকবেন না। যতটুকু সুযোগ পান কাজে লাগিয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।'

প্রথম রাতের লড়াইয়ে কমাণ্ডো বাহিনী আশাতিরিক্ত সাফল্য লাভ করল। তাদের যোগ্যতা ও বীরত্ব ছাড়াও এ সফলতার অন্যতম কারণ ছিল, শত্রুরা ছিল ক্লান্ত এবং একনাগাড়ে মরুভূমিতে থাকতে থাকতে প্রচণ্ড উত্তাপে তাদের ঘোড়াগুলোও ছিল ক্লান্ত, অবসন্ন।

তকিউদ্দিন এবার আর কোন ভুল করলেন না, সুযোগ পাওয়া মাত্র তার অবশিষ্ট বাহিনী নিয়ে পিছু হটা শুরু করলেন। তকিউদ্দিন যখন মিশর সীমান্তে প্রবেশ করলেন, তখন মাত্র অর্ধেক সৈন্য তাঁর সাথে ছিল। বাকী অর্ধেক সুদানের ময়দানে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিল। এক ব্যর্থ অভিযান শেষে চরম ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করে কমাণ্ডো বাহিনীর সহযোগিতায় তকিউদ্দিন কায়রো ফিরে এলেন।

ওদিকে ক্রাক রণাঙ্গণে চলছিল তীব্র লড়াই। নূরুদ্দিন জঙ্গীর ক্রমাগত ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষেপে দাউ দাউ করে জ্বলছিল

ক্রাক শহর।

নূরুদ্দিন জঙ্গীর প্রকৌশলীরা পরীক্ষামূলক মেনজানিক নিক্ষেপের সাফল্য ও ব্যর্থতা খতিয়ে দেখে এর ত্রুটিগুলো সারিয়ে তুলেছিল। এরপর চললো তাকে আরো উন্নততর করার অব্যাহত প্রচেষ্টা। এখন অল্প পাথর দিয়েও বেশি আগুন নিক্ষেপ করা যাচ্ছিল।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী দুর্গের আভ্যন্তরীণ মানচিত্র তুলে দিয়েছিলেন নূরুদ্দিন জঙ্গীর কাছে। এই মানচিত্রে গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্যবস্তু ও নিশানা চিহ্নিত করা ছিল। সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী মানচিত্র থেকে রসদের গুদাম খুঁজে বের করলেন। সৈনিকদের হুকুম করলেন আগুনের গোলা সেই গুদামে নিক্ষেপ করতে।

রসদের গুদামে মেনজানিক দিয়ে অগ্নিগোলা নিক্ষেপ করতে শুরু করলো জঙ্গীর বাহিনী। আগুনের প্রথম গোলা গিয়ে আঘাত হানলো খাদ্য গুদামে। গোলার আঘাতে আগুন জ্বলে উঠল খাদ্য দ্রব্যে। লকলকিয়ে আগুনের শিখা ছুটল উপর দিকে। জঙ্গীর সৈন্যদের মনোবল ও আস্থা বেড়ে গেল এতে।

মুসলিম বাহিনীর অস্ত্র নির্মাতারা আরো একটি সাফল্যের খবর দিল জঙ্গীকে। তারা জানাল, তারা এমন এক ধরনের তীর ধনুক বানিয়েছে যা বহু দূর নিক্ষেপ করা যায়।

জঙ্গীর সামনে হাজির করা হলো সেই তীর। এগুলো ব্যবহারের জন্য অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন সৈন্যের দরকার। দেখা গেল আট দশটি তীর নিক্ষেপের পরই সৈন্যরা কাহিল হয়ে পড়ছে। সুলতান জঙ্গী শারিরীকভাবে বলিষ্ঠ একদল সৈন্যের হাতে তুলে দিলেন সেই তীর।

সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গী এবার আরও একটি বীরত্বপূর্ণ

পদক্ষেপ নিলেন। একদল দুঃসাহসী সৈন্যকে পুরো বাহিনী থেকে বেছে আলাদা করলেন তিনি। তাদের বললেন, 'মর্দে মুজাহিদ আল্লাহর সৈনিকরা! শাহাদাতের পেয়ালা পান করার জন্য যারা উদগ্রীব আজ তাদের স্বপ্ন পূরণের দিন। আমি তোমাদের পাঠাতে চাই সেই সিংহ দরজায়, যে দরজা আটকে রেখেছে আল্লাহর সৈনিকদের অগ্রযাত্রা। আমি তোমাদের কেল্লার ফটকে আঘাত হানার জন্য নির্বাচিত করেছি।'

সৈনিকদের মধ্যে প্রাণের নতুন প্রবাহ সৃষ্টি হলো। ফটক ভাঙার যন্ত্রপাতি নিয়ে ওরা ঝাঁপিয়ে পড়লো কেল্লার মূল ফটকে।

এই জান কবুল বাহিনীর সৈন্যরা যখন ফটকের দিকে এগিয়ে গেল, ক্রুসেড বাহিনী পাঁচিলের ওপর থেকে তীরের স্রোত বইয়ে দিল। খৃস্টানদের তীরের আঘাতে প্রাণ বায়ু উড়ে গেল কোন কোন জানবাজের। আহত হলো অনেকে, কিন্তু এইসব জানবাজদের গতি তাতে মোটেই শিথিল হলো না। যারা বেঁচে গেল এবং পারল, ছুটে পাঁচিলের সাথে গিয়ে মিশে গেল ওরা।

সুলতান জঙ্গী দূর নিক্ষেপকারী তীরন্দাজ বাহিনী এবং সাধারণ তীরন্দাজ বাহিনীকে ফটকের দিকে কাতারবন্দী করে দাঁড় করাল। বলল, 'আল্লাহর সৈনিকেরা, বন্ধুদের কাভার দাও। ফটকের দু'পাশে পাঁচিলের ওপর এমনভাবে তীর বর্ষণ করো, খৃস্টানদের চোখগুলো যেন তীরের বদলে বিদ্যুতের ঝলক দেখতে পায়।'

আদেশ পাওয়ার সাথে সাথেই সৈনিকরা লাগাতার তীর বর্ষণ শুরু করে দিল।

দু'পক্ষের সীমাহীন তীর নিক্ষেপের ফলে দেয়ালের গোড়ায় কি হচ্ছে চোখে পড়ছিল না কোন পক্ষের। জানবাজ বাহিনীর আরেকটি দল ফটকের দিকে দৌড়ে গেল।

জঙ্গী তীরের বর্ষণ আরও তীব্রতর করে তুললেন। পাঁচিলের ওপর থেকে খৃস্টান সেনাদের কানফাটা চিৎকার ভেসে আসতে লাগল। দূর পাল্লার তীরগুলো যথাসময়ে মোক্ষম আঘাত হেনেছে। অসংখ্য খৃস্টান সৈন্য লুটিয়ে পড়েছে পাঁচিলের ওপর।

একটু পরেই খৃস্টানদের দিক থেকে তীর আসা কমে গেল। সিঁড়ি বেয়ে অনেকেই নেমে গেল ওপাশে। খৃস্টান সেনাপতি ওদের বললেন, 'জলদি ড্রাম তোল পাঁচিলে।'

সৈন্যরা আবার কাঠের বোঝা ও ড্রাম নিয়ে উঠে এল উপরে। ড্রামে ভিজিয়ে যেই ওরা কাঠে আগুন দিল, জ্বলন্ত কাঠের ফাঁক দিয়ে ড্রাম বহনকারী সৈন্যদের মাথাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল মুজাহিদদের কাছে। সাথে সাথে সেই মাথাগুলোকে তীরের নিশানা বানাল মুজাহিদরা।

দু'একটা ড্রাম বাদে বাকি ড্রামগুলো দেয়ালের ওপারেই গড়িয়ে পড়লো আবার। যে দু'একটা আগুনের শিখা ওরা এপাশে ছুঁড়ে মেরেছিল, দেখা গেল সে শিখার ওপর নিক্ষেপকারী নিজেও হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

সুলতান জঙ্গীর এক সহকারী সালার এতক্ষণ জঙ্গীর আক্রমণের পদ্ধতি দেখছিলেন। তিনি বললেন, 'সুলতান, আপনি এখানে আক্রমণ অব্যাহত রাখুন, আমি পেছনের ফটকের আক্রমণের অবস্থা দেখে আসি।'

জঙ্গীর অনুমতি নিয়ে তিনি প্রাণপণে ছুটে গেলেন কেল্লার

পিছনের ফটকে। ওখানকার কমাণ্ডারকে সামনের ফটকে সুলতান কিভাবে আক্রমণ পরিচালনা করছে বললেন তিনি। সহকারী সালারের নির্দেশে ওখানকার কমাণ্ডার জঙ্গীর পদ্ধতিতে পিছনের ফটকে তুমুল আক্রমণ শুরু করে দিল।

ওখানে দূর পাল্লার তীরন্দাজ না থাকায় প্রথম দিকে মুজাহিদদের বেশ বেগ পেতে হলো। আক্রমণ তীব্রতর করলে তা জানের ক্ষতি স্বীকার করেই করতে হতো। কিন্তু মুজাহিদরা এ সবের কোন পরোয়া করল না। যতই ক্ষতি হোক, আঘাত ওরা তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলল। তীরন্দাজদের সহায়তা নিয়ে একদল জানবাজ দ্রুত ছুটে গেল ফটক ভাঙতে।

প্রধান ফটকে ড্রাম নিয়ে ক্রুসেডারদের উপরে উঠে আসার আর সুযোগ দিচ্ছিল না মুসলিম তীরন্দাজরা। সুলতান জঙ্গী এবার মেনজানিক দিয়ে দুর্গের ভেতরে আগুন ও পাথর নিক্ষেপ করার হুকুম দিলেন।

সুলতান জঙ্গীর বাছাই করা সৈন্যরা কেল্লার উভয় ফটকে বীরত্বের সাথে আক্রমণ করছে দেখে সাধারণ সৈনিকদের মধ্যেও জেহাদী জযবার বান ডাকল। সুলতান তাদেরকে দু'টি দলে ভাগ করে দিলেন। এক দল কেল্লার সামনে চলে গেল আরেক দল চলে গেল কেল্লার পিছন দিকে। তারা দু'দিকে ছড়িয়ে পড়ে দেয়ালের ওপর এমন তীব্র তীর বর্ষণ শুরু করলো যে, পাঁচিলের ওপর থেকে খৃস্টান সৈন্যরা আবার লাফিয়ে নিচে নেমে গেল। পাঁচিলের ওপর এখন আর কোন খৃস্টান সৈন্যই পাহারায় নেই।

ফটক ভাঙার কাজে নিয়োজিত মুজাহিদরা প্রাণপণ

শক্তিতে আঘাত হানল ফটকের ওপর। মুজাহিদদের তীব্র আঘাত সইতে না পেরে এক সময় খৃস্টানদের দুর্ভেদ্য দুর্গের ফটক ভেঙে একদিকে হেলে পড়ল। সুলতান জঙ্গীর সৈন্যরা ঢুকে পড়লো কেল্লার ভেতরে।

এরপর শহরের মধ্যে শুরু হয়ে গেল রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ। শহরের খৃস্টান বাসিন্দারা পালানোর জন্য দৌড়াদোড়ি আরম্ভ করল।

এই হুড়োহুড়ি ও হই-হাঙ্গামার মধ্যে খৃস্টান শাসক ও সেনা কমাণ্ডাররা দুর্গের বাইরে পালিয়ে গেল। দিনভর শহরময় এই হাঙ্গামা ও হাতাহাতি লড়াই অব্যাহত রইল। সন্ধ্যা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে ক্রুসেড সৈন্যরা রণে ভঙ্গ দিয়ে অস্ত্রসমর্পণ করলো।

দুর্গে প্রবেশ করে সুলতান জঙ্গী প্রথমেই বেগার ক্যাম্পের বন্দী মুসলমানদের মুক্ত করে দিলেন। পরে লড়াই শেষে সন্ধ্যায় যখন সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করলো, সারা শহরে একজন ক্রুসেড নেতা ও কমাণ্ডারকেও খুঁজে পেলেন না।

ক্রাক দুর্গের এই রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটে ১১৭৩ সালের শেষ দিকে। মুসলমানরা এ সময় বায়তুল মুকাদ্দাসের খুব কাছাকাছি পৌঁছে যায়।

পরাজিত ক্রুসেড জেনারেলরা আবার একত্রিত হলো। পরাজয়ের পর এটাই তাদের প্রথম বৈঠক। যে কোন পরাজয় বা বিজয় লাভের পর এ ধরনের বৈঠকে বসাটা খৃস্টানদের একটা ট্রাডিশনে পরিণত হয়েছে। এ ধরনের বৈঠকে পরস্পর মত বিনিময় ছাড়াও অবধারিতভাবে থাকে মদ ও মেয়ে।

মত বিনিময়ের ফাঁকে ফাঁকে তারা শরাব পান করে। গভীর রাত পর্যন্ত চলে এ বৈঠক। যদি বৈঠক হয় আনন্দের, তবে নারী ছাড়া সে আনন্দের উচ্ছাস পরিপূর্ণ হয় না তাদের। আর যদি বিষাদ ও বেদনায় ভরা মন নিয়ে বৈঠকে বসে ওরা, মদ আর নারী হয় সে বিষাদ বেদনা থেকে মুক্তির হাতিয়ার। এ দুই জিনিস ছাড়া তাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের কথা চিন্তাই করা যায় না।

আগে এ ধরনের বৈঠকে বসলে কোন জেনারেল হয়তো বলতো, 'আমাদের মেয়ে গোয়েন্দাদের খবর কি? মুসলিম এলাকায় ওদের দিয়েই ধ্বংসাত্মক কাজ বাড়াতে হবে। তারা মুসলিম শাসকদের বশীভূত করে আমাদের অনুগত বানাবে আর সে এলাকার মুসলমান মেয়েদেরকে পথে বের করে মুসলমানদেরকে নৈতিকভাবে দেউলিয়া বানিয়ে দেবে।'

'এ জন্যই তো সালাহউদ্দিন আইয়ুবী বলে, ক্রুসেডাররা নারীর ইজ্জত নিয়ে ব্যবসা করে আর মুসলমানরা পালন করে নারীর সম্ভ্রমের রক্ষকের ভূমিকা।' বলতো অন্য জেনারেল।

জেনারেলরা এসব কথায় খুব হাসতো। তাদের মধ্যে কেউ হয়তো সুলতান আইয়ুবীকে ঠাট্টা করে বলতো, 'এ লোক মহা গোয়ার গোবিন্দ ঠিক, কিন্তু মোটা বুদ্ধির অধিকারী। নইলে আমাদের চাল ঠিকই ধরে ফেলতো। আরে আহাম্মক! খৃস্টান যুবকরা ক্রুসেড বাহিনীতে যোগ দিয়ে তোদের অকেজো করার জন্যই তো শরীরের শক্তি ব্যয় করে! তোরা বীর বিক্রমে তার মোকাবেলা করিস। কিন্তু তোরা জানিস না, আমাদের যুবকদের চাইতে আমাদের মেয়েরা আরো সফল যোদ্ধা। যুবকরা শরীরের শক্তি দিয়ে যা পারে না

মেয়েরা শরীরের সৌন্দর্য দিয়ে অনায়াসেই তা জয় করতে পারে!'

'আইয়ুবী এর মোকাবেলা করবে কি, ও তো এখনো জানেই না কত অসংখ্য ছোট বড় কর্মকর্তা, দুর্গাধিপতি ও সেনাপতিকে আমরা সুন্দরী নারী ও সোনার তোড়া বকশিশ দিয়ে বশীভূত করে রেখেছি। যাদের নিয়ে তিনি এত বড়াই করেন, তাদের অধপতনের খবর যদি তিনি জানতেন! জঙ্গী ও আইয়ুবীর ঘরেই আমরা খৃস্টানদের মানস সন্তান তৈরী করবো। এ থেকে তারা ইসলামকে কেমন করে রক্ষা করবে?'

কিন্তু আজকের বৈঠকে এ সবের কিছুই আলোচনা হলো না। এ বৈঠক হচ্ছিল বায়তুল মুকাদ্দাসের পবিত্র প্রাঙ্গণে। সময়টা ১১৭৩ সালের শেষ দিক। খৃস্টান জাতির নেতৃস্থানীয় লোকেরা সমবেত হয়েছিল এ বৈঠকে। তাদের মনের ভেতর বিষাদের ভার। সকলেই কেমন গম্ভীর, চিন্তান্বিত। তারা কেউ সুলতান আইয়ুবীকে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রুপ করলো না। কারো মুখে ভুলেও কোন হাসির ভাব ফুটে উঠল না। এমনকি শরাব ও নারীদের কথাও ভুলে গেল তারা।

তাদের এ দুশ্চিন্তার কারণ ছিল ক্রাকের বিপর্যয়। লজ্জার মাথা খেয়ে সেখান থেকে পালিয়ে এসেছে বড় বড় খৃস্টান জেনারেলরা। এদের মধ্যে ছিল দুর্গাধিপতি রোনাল্ডোও । তিনি একজন ভাল যোদ্ধা, রণকুশলী ও পারদর্শী সেনাপতি হিসাবে খ্যাতিমান ছিলেন। সুলতান আইয়ুবীর সাথে তার সৈন্যদের বহুবার যুদ্ধ হয়েছে।

এ বৈঠকে আরো ছিলেন সম্রাট রিমাণ্ড। ক্রাক রণাঙ্গণে সুলতান আইয়ুবীর বাহিনীকে পিছন থেকে আক্রমণ করে

নিঃশেষ করার সংকল্প ছিল তার। সে চেষ্টা তিনি করেও ছিলেন। কিন্তু আইয়ুবীর কৌশল ও দুরদর্শিতার কাছে হেরে গিয়ে সংকীর্ণ পাহাড় কুচিতে আটকে পড়েছিলেন তিনি। আইয়ুবীকে নিশ্চিহ্ন করার সংকল্প ও স্বপ্ন-সাধ হারিয়ে উল্টো নিজেই অবরোধের মধ্যে আটকা পড়ে অসহায় হয়ে গেলেন। রসদপত্র সব ছিনিয়ে নিল আইয়ুবীর দল।

চরম খাদ্য সংকটে পড়ে সেনাবাহিনী বিপর্যস্ত ও নাজেহাল। যুদ্ধের ঘোড়া আর উটগুলো মেরে মেরে খেতে হলো, বাঁচার তাগিদে। শেষে অর্ধেক সৈন্য হারিয়ে তিনি কোন রকমে পালিয়ে এসেছেন।

দুর্গের অধিপতি রোনাল্ডো কপালগুণে বেঁচে গেছেন। আইয়ুবীর ফৌজ দুর্গে ঢুকলে শিরস্ত্রাণ, বর্ম, পোশাক সব খুলে ফেলে সাধারণ লোকের বেশে কোন রকমে পালিয়ে আসতে সক্ষম হন তিনি। সেনাপতির সেই সাজপোষাক পাল্টাতে না পারলে আজকের এই সম্মেলনে জীবিত শামিল হওয়া তার পক্ষে সম্ভব হতো না।

এ বৈঠকে ক্রুসেডদের সেই রণবীর যোদ্ধা সেনাপতিরাও অংশগ্রহণ করেছিল, যাদেরকে তাদের বীরত্বের জন্য নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল। এই সম্মানজনক উপাধি, সম্রাটদের পক্ষ থেকে দেয়া লৌহ বর্ম, সামরিক ব্যাজ ও পোষাক সব কিছুই যেন আজ তাদের উপহাস করছে।

এ সম্মেলনে আরো এসেছিলেন ক্রুশের মহান রক্ষক, ক্রাক শহরের সম্মানিত পুরোহিত। ছিলেন অবারলফ ও তার ভাই ইমারলফ। প্রধান অতিথি হিসেবে যোগদান করেছিলেন মুসলমানদের চিরশত্রু ফিলিপ অগাষ্টাস ।

সম্মেলনে উপস্থিত এইসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা গভীর আগ্রহ ও উৎকণ্ঠা নিয়ে তাকিয়েছিল সম্মিলিত ক্রুসেড বাহিনীর অবিসংবাদিত নেতা, গোয়েন্দা বাহিনী প্রধান হরমন ও তার সংগীদের দিকে। পরিস্থিতির নতুন কোন অবনতি বা অগ্রগতির খবর থাকলে তা তাদের কাছেই পাওয়া যাবে।

সম্মেলন হলে এসে বসেছে সবাই, কিন্তু কারো মুখে কোন কথা নেই। জমাটবাঁধা নীরবতা অসহনীয় হয়ে উঠলে শেষে প্রথমে মুখ খুললো ফিলিপ অগাস্টাস, সঙ্গে সঙ্গে মাহফিলে যেন প্রাণ ফিরে এলো। তিনি ক্রুশের মহান রক্ষক সম্মানিত পুরোহিতকে সভাপতি হিসাবে সভা শুরু করার অনুরোধ করলেন।

সম্মানিত পুরোহিত সভার শুরুতেই বললেন, 'আমি ঐসব লোকের সভায় সভাপতিত্ব করতে লজ্জাবোধ করছি, পবিত্র ক্রুশ ছুঁয়ে শপথ করার পর যারা তাদের সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে। আমি তাদেরকে ধিক্কার জানাচ্ছি, যারা পবিত্র প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বায়তুল মুকাদ্দাসে জীবিত ফিরে এসেছে এবং এতবড় ব্যর্থতার পরও সুস্থ্য শরীরে এই মহান দরবার কক্ষে এসে আসন গ্রহণ করেছে।

আজ আমি যীশুর সামনে খুবই লজ্জিত। আমি যতবার ক্রুশের দিকে তাকাই ততবার আমার দৃষ্টি নিচু হয়ে যায়। তোমরা সবাই কি ক্রুশের ওপর হাত রেখে এই হলফনামা পাঠ করোনি, তোমরা ক্রুশের শত্রুদের দুনিয়ার বুক থেকে শেষ করে দেবে? যদি এর জন্য প্রাণ দিতে হয় তবুও কেউ পিছপা হবে না? তোমরা কি আরও হলফ করোনি, ইসলামের নাম নিশানা দুনিয়ার বুক থেকে মিটিয়ে দেয়ার জন্য নিজের

জান, মাল অকাতরে কোরবান করবে? প্রয়োজন হলে কোরবান করবে পরিবার পরিজন, সন্তান সন্ততি এবং দেহের শেষ রক্তবিন্দু?

এখানে আমার সামনে যারা বসে আছো, তাদের মধ্যে এমন কে আছো যার শরীরে সামান্যতম জখমের দাগ আছে? বলো, কে আছো?'

কেউ উঠে দাঁড়াল না, কেউ হাতও তুলল না।

তিনি বললেন, 'জানি, আমার এ প্রশ্নের উত্তর দেয়ার সাহস কারো নেই। তোমাদের মধ্যে এমন একজনও নেই যার গায়ে আঘাতের চিহ্ন আছে। এই তোমরা কি সেই তোমরা নও, যারা মুসলমানদের হাতে সুবাক ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে এসেছিলে! সেই তোমরাই এখন আবার ক্রাক শহর মুসলমানদের হাতে তুলে দিয়ে ছুটে এসেছো এখানে।

আমি জয়-পরাজয়ের বাস্তবতাকে আমি অস্বীকার করি না। ময়দানে যুদ্ধ করতে গিয়ে দু'একবার পরাজয় বরণ করতে হতেই পারে! দু'টি সফলতার পর একটি পরাজয় কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু একের পর এক সর্বক্ষেত্রে পরাজয় বরণ করার অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। আমার এখন মনে হচ্ছে, খৃস্টানরা ইউরোপে বন্দী হয়ে আছে। মনে হচ্ছে, সে সময় খুব দূরে নয়, যখন ইউরোপের গীর্জায় গীর্জায় আজানের ধ্বনি মুখরিত হবে।'

'এমনটি কখনও হবে না সম্মানিত পিতা!' ফিলিপ অগাস্টাস বললেন, 'হে মহান ক্রুশের রক্ষক! এমনটি কখনও হবে না। পরাজয়ের কিছু কারণ ছিল। এ বিষয়ে আমরা চিন্তা-ভাবনা করেছি, এখন আপনার উপস্থিতিতে আরও

চিন্তা-ভাবনা করব এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত এবং পদক্ষেপ নেবো।'

সম্মানিত পিতা আবার বললেন, 'যদি এর পরও তোমরা গভীর চিন্তা না করো এবং কঠিন পদক্ষেপ না নাও তবে এই বায়তুল মুকাদ্দাস মুসলমানদের হবে। তোমরা কি জানো না, সুলতান সালাহউদ্দিন বায়তুল মুকাদ্দাস অধিকার করার কসম খেয়ে ময়দানে নেমেছে? তোমরা কি জানো না, মুসলমানদের প্রথম কেবলা বায়তুল মুকাদ্দাস, যার জন্য তিনি তাঁর শিশুদেরও কুরবানী দিতে এক পায়ে খাড়া?'

'আমরা মুসলমানদের মধ্যে গাদ্দারীর বীজ বপণ করে রেখেছি।' ফিলিপ আগাস্টাস বললেন, 'আমরা মুসলমানদের মধ্যে এত গাদ্দার সৃষ্টি করে রেখেছি যে, তারাই গাজী সালাহউদ্দিন ও সুলতান নূরুদ্দিন জঙ্গীকে বায়তুল মুকাদ্দাসের রাস্তায় আটক সেখানে পুঁতে রাখবে।'

'তবে সে মুসলমান কারা যারা তোমাদের হাত থেকে এত মজবুত ও শক্ত দুর্গ ছিনিয়ে নিয়ে গেলো?' তিনি সবাইকে উদ্দেশ্য করে স্পষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'এই সত্য কখনও ভুলে যেয়ো না, মুসলমানরা স্বাধীনচেতা জাতি। মুসলমান যখন গাদ্দারী করতে প্রস্তুত হয় তখন তারা আপন ভাইয়ের গলায় ছুরি চালায়। কিন্তু যখন তাদের মধ্যে জাতীয় চেতনাবোধ ও ঈমানী জযবা জেগে উঠে তখন তারা নিজের জীবন দিয়ে সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে।

মুসলমান যদি গাদ্দারও হয় তবু তাদেরকে বিশ্বাস করবে না। বেশি দূরে যেতে হবে না; শুধু গত দশ বছরের ঘটনার উপরেই দৃষ্টি রাখো। ইসলামের গাদ্দাররা তোমাদেরকে

কতটুকু স্থান দখল করিয়ে দিয়েছে? মিশরে পা রাখার মত কি তোমাদের সাহস আছে? আজ যদি মুসলমানরা ফিলিস্তিনের ওপর বসতে পারে, কাল তোমাদের বুকের ওপর গিয়ে বসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

স্মরণ রেখো, হে আমার বন্ধুগণ! যদি সালাহউদ্দিন আইয়ুবী ও নূরুদ্দিন জঙ্গী তোমাদের থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে নিতে পারে, তবে তারা তোমাদের কাছ থেকে ইউরোপও ছিনিয়ে নেবে। কিন্তু প্রশ্ন এখানে শুধু ইউরোপ ও ফিলিস্তিন নয়। জমিনের কোন অংশের নয়; আসল সমস্যা ক্রুসেড ও ইসলামের! এই দু'টি ধর্মের মতাদর্শের মধ্যেই এই যুদ্ধ। এই দু'য়ের মধ্যে একটি শেষ হতে হবে! তোমরা কি ক্রুসেডদের নিঃশেষ হয়ে যেতে বলো?'

'না! পবিত্র পিতা, না! এমন কখনও হবে না। আমরা আপনাকে এত বেশি নিরাশ হতে দেবো না।'

'তাহলে সেই কারণ খুঁজে বের করো, যা তোমাদের পিছু হটার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি তোমাদের যুদ্ধ সম্পর্কে কোন পরামর্শ দিতে পারবো না। আমি গীর্জার সেবক। আমার গীর্জার কুমারীদের কসম! দশটা কট্টর মুসলমান সামনে নিয়ে এসো, তাদেরকে ক্রুশের পূজারী বানিয়ে দেবো। আমি বুঝতে পারি না, তোমাদের মধ্যে আছে বড় বড় বীর, নাইট, সামরিক জেনারেল, তোমরা কি চমৎকার ব্যাজ ও সামরিক পোষাক পরো, অথচ অল্প সংখ্যক সাধারণ মুসলমান সেনাদের সাথে কেন মোকাবেলা করতে পারো না? তোমাদের পাঁচশো অশ্বারোহী সৈন্যকে মাত্র একশো পদাতিক মুসলিম সেনা কি করে পরাজিত করে?

তারা তা পারে শুধু এই কারণে, মুসলমানরা ধর্মের উন্মাদনা নিয়ে যুদ্ধ করে। যখন তারা তোমাদের সামনে আসে, তখন কসম খেয়ে আসে। হয় সফলতা নয় মৃত্যু, এর বাইরে আর কোন পথের খবর জানা নেই তাদের। আমি শুনেছি, তাদের ছোট ছোট কমাণ্ডো বাহিনী যখন তোমাদের পিছনে আঘাত হানে তখন তোমাদের তীরের আঘাতে তারা জর্জরিত হয়ে যায়, কিন্তু অরা প্রাণের মায়া না করে এমন বিদ্যুৎগতিতে তোমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং তোমাদের কোমর ভেঙ্গে দিয়ে সরে যায়, যা তোমাদের চোখে তাক লাগিয়ে দেয়।

একবার চিন্তা করো, মাত্র দশ বারো জনের ছোট্ট একটি দল কেমন করে তোমাদের হাজার সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে যায়? কোন সাহসে তারা ঢুকে? এটা আর কিছু নয়, শুধুই ধর্মীয় উন্মাদনা। তারা মনে করে, আল্লাহ তাদের সাথে আছেন, আল্লাহর রাসূলের রূহানী শক্তিও সঙ্গে আছে তাদের। কেবল কমাণ্ডারের হুকুমে তারা এমন বীরত্ব প্রদর্শন করে না, এই বীরত্ব প্রদর্শন করে তারা আল্লাহর হুকুমে।

আমি খুব মনোযোগ দিয়ে কুরআন পাঠ করেছি, আমাদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধকে কুরআন জিহাদ বলে অভিহিত করেছে। আর এই জিহাদ প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ করে দিয়েছে কোরআন। এমন কি অন্যান্য ফরজ ইবাদত, যেমন নামাজ, রোজা ও হজ্বের চেয়েও বেশি গুরুত্ব দেয়া হয় জিহাদকে। যতক্ষণ তোমরা তোমাদের মধ্যে এমন উন্মাদনা সৃষ্টি করতে না পারবে ততোক্ষণ তোমরা ইসলামের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না।'

পবিত্র পিতার আবেগময় সত্য ভাষণে পরাজিত সেনাপতি, রাজন্যবর্গ ও সেনা কমাণ্ডারদের মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হলো। তিনি এই বলে বিদায় নিলেন, 'এখন তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের পরাজয়ের কারণ নিয়ে আলোচনা করো এবং কি করে এই পরাজয়কে বিজয়ে রূপান্তরিত করা যায় তা ঠিক করো। বায়তুল মুকাদ্দাসকে জীবন মরণের সমস্যা বানিয়ে নাও। সালাহউদ্দিন আইয়ুবী কোন ফেরেশতা নয়, সে তোমাদের মতই একজন মানুষ। তার শক্তির উৎস তার ঈমানে বলিষ্ঠতা। তোমরাও তোমাদের কাজে সেই বলিষ্ঠতার প্রকাশ দেখাও।'

পাদরী তার কথা শেষ করলেন এবং আপন কর্তব্য নির্ধারণের জন্য তাদেরকে বৈঠকে রেখে তিনি বিদায় নিলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পর অগাস্টাসের সভাপতিত্বে বৈঠক পূনরায় শুরু হলো এবং আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তও গৃহীত হলো।

এ বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, এখন থেকে সালাহউদ্দিনের যে কোন হামলার বলিষ্ঠ জওয়াব দেয়া হবে, তবে নিজে থেকে আক্রমণ করা হবে না।

আইয়ুবী ও জঙ্গীর অগ্রযাত্রায় বাঁধা না দিয়ে তাদের এতটা পথ অগ্রসর হওয়ার সুযোগ দিতে হবে, যেন তারা নিজেদের সীমানা থেকে অনেক দূরে সরে আসে। তাদের দু'জনকে পরষ্পর বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে হবে। এতে তাদের খাদ্যশস্য ও রসদ পৌছানোর পথ দীর্ঘ ও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়বে।

আরও সিদ্ধান্ত নেয়া হলো, গ্রীস ও ফ্রান্সের বাহিনীকে

অতিসত্তর প্রস্তুত করে তাদেরকে সমুদ্র পথে মিশর আক্রমণে পাঠানো হবে। তারা সমুদ্র তীরে সৈন্য অবতরণ করে মিশরের উত্তর-পূর্ব দিকে অভিযান চালাবে। উত্তর-পূর্ব দিকের বিরাণ এলাকাগুলো দখল করে সেখানে তারা সুদৃঢ় ক্যাম্প স্থাপন করবে। ওখান থেকেই মিশরের মূল ভূখণ্ডে প্রকাশ্যে জোরদার আক্রমণ করা সম্ভব হবে।

বৈঠকে গোয়েন্দা প্রধান হরমন জানালেন, অধিকৃত অঞ্চলে মুসলমানদের জীবন অতিষ্ট করে তোলা হয়েছে। তারা নিরুপায় হয়ে দলবল বেঁধে হিজরত করছে। এই সব কাফেলা পথের মাঝে লুট হয়ে যাচ্ছে। তাদের সহায় সম্পদ ও পশুপাল কেড়ে নেয়া হচ্ছে।

তিনি আরো জানলেন, কাফেলা থেকে মুসলিম মেয়েদের কিডন্যাপ করে নিরাপদ জায়গায় সরিয়ে নেয়া হচ্ছে এবং তাদের ধর্মান্তরিত করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। এভাবে মুসলমানদের বংশ ধ্বংস করার প্রচেষ্টাও চালু রাখা হয়েছে।

বিশেষ করে ছোট ও কিশোরীদের ছিনতাই করে তাদের পূর্ব পরিচয় ভুলিয়ে দেয়া হচ্ছে। তাদেরকে বেহায়া ও নির্লজ্জতার প্রশিক্ষণ দিয়ে যখন তারা যুবতী হয়ে উঠে তখন তাদেরকে পাঠানো হচ্ছে মুসলমানদের গাদ্দারদের বানানোর জন্য, তাদের চরিত্র ও ঈমান নষ্ট করার জন্য।

হরমন এরপর উপস্থিত সবাইকে একটি দুঃসংবাদ দিলেন। বললেন, 'সীমান্ত এলাকায় পীর সেজে জনগণকে বিভ্রান্ত করার যে জাল বিস্তার করেছিল রবার্ট, সে মিশন ব্যর্থ ও ধ্বংস হয়ে গেছে। যে সব মুসলমানকে সে প্রভাবিত

করেছিল তারাই রবার্টসহ মিশনের অন্যান্য সবাইকে হত্যা করেছে।'

উপস্থিত রাজন্যবর্গ বললেন, 'কিন্তু সীমান্ত এলাকাসহ সমগ্র মিশরে খৃস্ট ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের প্রচার ও ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর কাজ যে কোন মূল্যে চালু রাখা এবং জোরদার করা জরুরী।'

হরমন বললেন, 'আমি আপনাদের সাথে একমত। কিন্তু সমগ্র মিশরে খৃস্ট ধর্মের প্রচার ও প্রসারের কাজ চালাতে অঢেল অর্থ সম্পদের প্রয়োজন। সমস্যা হচ্ছে সেখানে অর্থ পাঠানো নিয়ে।

রবার্টের মিশন ব্যর্থ হওয়ার পর সালাহউদ্দিন সীমান্তে পাহারা জোরদার করেছে। সীমান্ত পথে এখন অর্থ পাঠানো খুবই বিপদজনক। সাধারনতঃ আমরা অর্থ সম্পদ উটের কাফেলার সাথে পাঠাতাম।

সম্প্রতি এ ধরনের কয়েকটি কাফেলা মিশরের সীমান্ত প্রহরীদের হাতে ধরা পড়েছে। তারা সমুদয় অর্থ সম্পদ আটক করে, এমনকি উটগুলোও নিয়ে যায়। এ সমস্যার সমাধান করতে না পারলে মিশরে এখন কাজ চালানোই সমস্যা হয়ে যাবে।'

অগাস্টাস বললেন, 'এ জন্য আমরা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। প্রয়োজনে মিশর থেকেই তাদের সব ধরনের সাহায্য দেয়া যাবে। দীর্ঘদিন ধরে একটি বিষয়ে আমি চিন্তা-ভাবনা করছিলাম। মিশরের মাটির নীচে এত অজস্র ধন সম্পদ, মনিমানিক্য, রত্ন ও স্বর্ণ লুকানো আছে, যা দিয়ে সমস্ত বিশ্ব খরিদ করা যায়।'

'কিন্তু সে সব সম্পদ আহরণ করা তো আকাশের তারকা ছিঁড়ে আনার মত ব্যাপার!' বিস্মিত কণ্ঠে বললেন হরমন।

'হ্যাঁ, এসব সম্পদ আহরণ করা যথেষ্ট কঠিন হবে ঠিক, কিন্তু আমরা জানি, ফেরাউনের লাশের সঙ্গে এসব সম্পদ পিরামিডে সুরক্ষিত আছে। ইতিহাসে ফিরাউনের বিধান ও নিয়ম সর্ম্পর্কে বিস্তারিত লেখা আছে। কোন ফেরাউনের মৃত্যুর পর তাঁর সাথে তার সমুদয় ব্যক্তিগত সম্পদ ও ব্যবহার্য দ্রব্য সবই তাঁর সঙ্গে তার কবরে রেখে দেয়া হতো।

মৃত ফেরাউনের কবর কয়েক গজের বেশি চওড়া ছিল না, কিন্তু তার জন্য মাটির নীচে একটি মহল তৈরী থাকতো। ফেরাউন তার জীবদ্দশাতেই তার কবরের ব্যবস্থা করে যেতেন এবং স্থানটি এমনভাবে বাছাই করতেন, যেন তার মৃত্যুর পর কেউ সেখানে পৌছতে না পারে। মৃত্যুর পর তার লাশ এমন গোপনীয়তার সাথে সে কবরে রাখা হতো যার খবর সেই কবর খোদক ছাড়া আর কেউ জানতো না। লাশ মমি করে দাফন করা শেষ হলে সেই কবর খোদককে হত্যা করা হতো।

ফেরাউনরা নিজেকেই খোদা বলে বিশ্বাস করতো এবং মনে করতো মরার পরও তার শান শওকত অবিকল তাই থাকবে। সুতরাং পাহাড় কেটে সেই পাহাড়ের তলদেশে রাজকীয় মহল তৈরী করা হতো। তাতে থাকতো বিভিন্ন কামরা। আর সে কামরাগুলো ভরে তোলা হতো হীরা জহরত দিয়ে। এমনকি ঘোড়াসহ অশ্ব চালিত গাড়ী এবং মাল্লাসহ কিস্তি রাখা থাকতো তাতে।

তাঁর খেদমতের জন্য সেখানে দাস দাসী এবং বিবিও রাখা হতো। এমনি করে একটি লাশের সাথে অপরিমেয় ধন

সম্পদও দাফন হয়ে যেতো। দাফনের পর এমনভাবে কবরের মুখ ঢেকে দেয়া হতো যাতে কবরের কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া না যায়।

ফেরাউনের লাশকে মশলা ও আরক মিশিয়ে জমাটবদ্ধ করা হতো। একে বলা হয় মমি। হাজার হাজার বছর ধরে এ মমি অবিকল আগের মতই আছে। যার কিছু নমুনা লণ্ডনের যাদুঘরেও সংরক্ষিত আছে।

ফেরাউনের যুগ শেষ হওয়ার পর মিশরে যে লোকই শাসন কর্তৃত্বে এসেছে সেই ফেরাউনের লাশ অনুসন্ধান করেছে। এই অনুসন্ধান প্রচেষ্টায় তারা যেসব সমস্যায় পড়েছে তার একটি রিপোর্ট আছে আমার কাছে। এ ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করছি আমি।

মিশর তার ইতিহাসে বহু রাজা-বাদশাহ দেখেছে। প্রত্যেক বাদশাহই ফেরাউনের কবর অনুসন্ধান করেছে। যে যা পেয়েছে নিয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি পেয়েছে ইংরেজ সরকার। কারণ ইংরেজরা বর্তমান যুগে বিজ্ঞানের প্রভাব কাজে লাগিয়েছে সবচে বেশি। আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ইংরেজরা যে পরিমাণ কবর আবিস্কার করতে পেরেছে অন্য কেউ তা পারেনি। তবুও লোকে বলে, মিশরের মাটি এখনো ফেরাউনের সম্পদে পরিপূর্ণ।

ব্যক্তিগত পর্যায়েও কেউ কেউ ফেরাউনের লাশ অনুসন্ধানে বের হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকে কবরও খুঁজে পায়। কিন্তু কবরে নামার পর ওরা কোথায় গায়েব হয়ে গেছে সে হদিস আর পাওয়া যায়নি।

অবশ্য ব্যতিক্রমও আছে। একবার একদল লোক একটা

কবর খুঁজে পেয়ে ভেতরে ঢুকে গিয়েছিল। একটু পর তারা হুড়মুড় করে ছুটে বেরিয়ে আসে। লোকগুলোর চোখ ভয়ে বিস্ফারিত ছিল। কি দেখে তারা ভয় পেয়েছে জানার অনেক চেষ্টা করা হয়েছে, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। লোকগুলো বোবা হয়ে গিয়েছিল, কেউ কোন কথা বলতে পারেনি।

এ জন্য অনেকে বিশ্বাস করে, ফেরাউন খোদা নয় বটে কিন্তু মরার পরেও তার এমন শক্তি রয়েছে, যে জন্য তার লাশের কাছে সাধারণ মানুষ যেতে পারে না। লোকেরা আরো বিশ্বাস করে, কোন সরকার ফেরাউনের কবরে হাত দিলে তার রাজত্বের অবসান ঘটে। ফলে অনেকেই ফেরাউনদের অশুভ শক্তি মনে করে।

সালাহউদ্দিন আইয়ুবী এখন মিশরের ক্ষমতায়। সে ফেরাউনের ধনরত্নের কতটুকু খবর রাখে জানিনা, তবে আমি জানি মিশরের মাটির নীচে এখনো ধনরত্নের বিশাল খনি আছে।

শুধু আমি নই, সকল খৃস্টান শাসকরাই এ খবর রাখে। এ জন্য সকলেই মিশরের সে খনির দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

সুলতান আইয়ুবীকে পরাজিত করা সহজ নয়। এ জন্য সবাই চিন্তা করছে, মিশরবাসীদের দিয়েই সে গুপ্তধন অনুসন্ধান করার। আমি আরো খবর পেয়েছি, মিশর সরকারের পুরাতন কাগজপত্রে এমন সব লেখা ও নকশা আছে যার মধ্যে ফেরাউনদের কবর সম্পর্কে তথ্য দেয়া আছে। এই কাগজগুলো উদ্ধার করতে পারলে গুপ্তধনের ভাণ্ডার আবিষ্কার করতে খুব বেশি কষ্ট হবে না।

আমরা মিশরে বিচক্ষণ গোয়েন্দা পাঠিয়েছিলাম শুধু এটুকু জানার জন্য যে, এ কাগজপত্রগুলো কোথায় আছে এবং কেমন করে তা উদ্ধার করা যায়। কিন্তু যার তত্ত্বাবধানে এগুলো আছে তাকে এখনো বাগে আনা যায়নি।'

গোয়েন্দা প্রধান হরমন বললেন, 'যখন সুলতান আইয়ুবী সুবাক ও ক্রাকের যুদ্ধে ব্যস্ত ছিলেন তখন আমিও একবার চেষ্টা করেছিলাম। মিশরে তখন আমাদের গোয়েন্দারা ভালই সুবিধা করে নিয়েছিল। এ ব্যাপারেও তারা কিছুটা সফলতা লাভ করেছিল। সুলতান আইয়ুবীর সেনাবাহিনীর উর্ধতন অফিসার আহমদ দরবেশকে তারা মুঠোর মধ্যে নিতে পেরেছিল। আহমদ দরবেশ সুদানী হলেও তাঁর বিরুদ্ধে কখনো গাদ্দারীর কোন অভিযোগ উঠেনি। তিনি সুলতান আইয়ুবীর খুবই বিশ্বস্ত ছিলেন এবং সুলতান আইয়ুবীর অধীনে যুদ্ধ করে যথেষ্ট সুনাম কুড়িয়েছিলেন।

আমি যে রিপোর্ট পেয়েছি তাতে জানা যায়, মেরিনা নামে এক খৃস্টান মেয়ের ফাঁদে পড়ে আহমদ দরবেশ। এই মেয়ে তাকে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়। তাকে মিশর ও সুদানের মাঝে একটি অঞ্চলের স্বাধীন সুলতান বানানোর লোভ দেখায় মেরিনা।

ইতিমধ্যে নূরুদ্দিন জঙ্গী ক্রাক দখল করায় এবং সুলতান আইয়ুবী মিশরে বিশ্বাসঘাতকদের নির্মূল অভিযান শুরু করায় তিনি এখন চুপ মেরে আছেন। অবশ্য এর মধ্যে মেরিনার সাথে তার কয়েক দফা মিলন ঘটেছে। এমন গোপনীয়তার সাথে তিনি সাক্ষাৎ করেন, কেউ এখনো জানতে পারেনি, তিনি আমাদের সাথে গোপন আঁতাত করেছেন।

আহমদ দরবেশ এতই প্রভাব বিস্তারকারী অফিসার যে, পুরাতন নথিপত্রের ফাইল পর্যন্ত পৌছতে পারেন তিনি। সেখান থেকে তিনি যেসব কাগজপত্র চুরি করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তাতে দেখা যায় কিছু কাগজের ওপর উদ্ভট ধরনের রেখা ও নকশা আঁকা। এগুলো আসলে কোন কাগজ নয়, কাপড় ও চামড়ার মাঝামাঝি জাতীয় জিনিস। কাগজ বিশেষজ্ঞরা বলেছে, এর নাম নাকি মেমফিস।

এ মেমফিসের ওপর যে লেখা ও নকশা তা খুবই দুর্বোধ্য। ফেরাউনের সময়কার দুর্লভ ও আশ্চর্য কাগজ এই মেমফিসের লেখা ও রেখা পড়া বা বুঝা বড়ই মুশকিলের ব্যাপার। সবাইকে তা দেখানোও বিপদজনক।

যাই হোক, আমার বিশেষজ্ঞরা যতটুকু তথ্য উদ্ধার করতে পেরেছে তাতে দেখা যায়, কায়রো থেকে প্রায় আঠারো মাইল দূরে একটি দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চল আছে। এই অঞ্চলটি এতই দুর্গম ও ভয়াবহ যে, লোকে ওই অঞ্চলকে মৃত্যু উপত্যকা বলে। মানুষ তো দূরের কথা, ওখানে কোন হিংস্র পশুও যেতে পারে না। সেই মৃত্যু উপত্যকার কোন এক জায়গায় একজন ফেরাউনের কবর আছে।

কিন্তু আমি নিশ্চিত নই এ তথ্য কতটুকু সত্য ও নির্ভুল। রেখাগুলোর মধ্যে হাতে আঁকা কয়েকটি ছবিও আছে। গল্পের কিছু অংশ ঐ ছবিগুলিতে লুকানো আছে বলে মনে হয়।

আহমদ দরবেশ ভাগ্য পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। এই ফেরাউনের নাম দ্বিতীয় রিম্যান্স। এই অভিযানে তার কিছু বুদ্ধিমান, পরিশ্রমী ও বিশ্বস্ত লোকের দরকার হলো। আমরা কবরের অনুসন্ধান ও খোদাই কাজের জন্য কায়রোতে

অবস্থানরত আমাদের কিছু সচেতন ও পরিশ্রমী গোয়েন্দাকে তার সাথে দিলাম। এদের নেতা হিসাবে দিলাম ইটালীর ভ্রমণ বিশারদ ও পর্বত আরোহী মার্কলিকে।

আহমদ দরবেশ এই লোকদের নিয়ে অভিযানের প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। দু'জনকে নিজের বাড়ীতে চাকর রাখলেন যাতে যে কোন সময় অন্যদের শামিল হওয়ার খবর দিতে পারেন। ছদ্মবেশ ধারণের প্রাকটিস শুরু করলেন, যেন যাওয়ার আগে ছদ্মবেশ ধরলে কায়রোর কেউ তাকে চিনতে না পারে।

আহমদ দরবেশের সঙ্গে আমাদের চুক্তি হলো, তিনি যে ধনরত্ন পাবেন তা নিজের প্রয়োজনে আর সুলতান সালাহউদ্দিনের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করবেন। সহকারী হিসেবে যাদের নিবেন তাদের নামমাত্র মজুরী দান করবেন।

সুলতান আইয়ুবীকে হত্যার পিছনে তিনি যে অর্থ ব্যয় করবেন তার বিনিময়ে যখন মিশর খৃস্টানদের হাতে আসবে তখন তাকে একটি স্বাধীন দেশের শাসক বানিয়ে দেয়া হবে। যার কিছু অংশ নেয়া হবে মিশর থেকে, কিছু অংশ থাকবে সুদানের। তাকে এ কথাও বলা হয়েছে, সেই অনুসন্ধানের সময় যদি সুলতান আইয়ুবী খৃস্টানদের ওপর আক্রমণ চালায় তবে আহমদ দরবেশ তার বাহিনীকে সুলতান আইয়ুবীর বিরুদ্ধে ব্যবহার করবেন।

আহমদ দরবেশ খুশিতে বিভোর হয়ে একদিন তার কাছে চাকরের ছদ্মবেশে আমাদের যে দু'জন গোয়েন্দা ছিল তাদেরকে নকশা দিয়ে ফেরাউনের কবরের অনুসন্ধানে এক মিশন পাঠিয়ে দিল। গোয়েন্দা মারফত আমাকে সংবাদ

পাঠাল, 'অনুসন্ধান কাজ শুরু হয়ে গেছে।'

হরমন বললেন, 'আহমদ দরবেশ যদি সফল হতে পারে এবং এ কবর আবিষ্কার হয়ে যায় তবে তার থেকে যে ধনরত্ন পাওয়া যাবে তা দিয়েই মিশরের ধ্বংসের মূল কাজটা শুরু করা যাবে।'

বৈঠক শেষ হলো। সুলতান আইয়ুবী জানতেও পারলেন না, তার বিরুদ্ধে চক্রান্তের আরেক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে যাচ্ছে।

####

পরবর্তী বই

ক্রুসেড-৮

ফেরাউনের গুপ্তধন

ঘোষণা

বিশ্বব্যাপী চলছে ইসলামী পূনর্জাগরণ। চলছে ইসলামবিরোধী শক্তির নির্যাতন– হত্যা, গুম, খুন, ষড়যন্ত্র। মুক্ত বিশ্বের মানুষ তার অনেক খবরই জানতে পারছে। কিন্তু চীনের অবস্থা? ওখানে কি কোন মুক্তি আন্দোলন নেই? চীনের মুসলমানদের ওপর কি কোন নির্যাতন চলছে না?

চলছে। কিন্তু সে খবর চীনের প্রাচীর ডিঙিয়ে মুক্ত বিশ্বে আসতে পারছে না। আর তাই দুনিয়ার মানুষ জানতে পারছে না সেখানকার মুসলমানদের অবর্ণনীয় দুঃখ যন্ত্রণার কাহিনী।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু চীনের মুক্তিপাগল মানুষের মরণপণ সংগ্রামের কাহিনী নিয়ে লিখেছেন এক নতুন রহস্য সিরিজ– **'অপারেশন'**। আগামী মাস থেকে প্রতি এক মাস অন্তর বেরোবে **'অপারেশন সিরিজের'** একটি করে বই।

তাওহীদুল ইসলাম বাবু রচিত অপারেশন সিরিজের প্রথম বই

আতঙ্কিত নানকিং

প্রায় প্রত্যেকটি শহরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। শাংহাই থেকে শুরু হয়েছে কিডন্যাপ, গুপ্তহত্যা, লুণ্ঠন, সন্ত্রাস ও অত্যাচার। আহত ও স্বজনহারাদের আর্তচিৎকারে প্রকম্পিত হচ্ছে আকাশ বাতাস। কমাণ্ডারইনচীফ রবিন বেপরোয়া হয়ে ছুটছে অপরাধী চক্রের পেছনে। শুরু হল সংঘর্ষ।

কার্লোস ডেভিড তার নির্যাতনের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়। আণ্ডারগ্রাউণ্ড সেলে বন্দী করে রবিন রাসেলকে। ভীমন আগলী ক্ষ্যাপা কুকুরের মত উন্মত্ত হয়ে উঠে। 'হোয়াইট বিয়ার' রবিনের চোখ উপড়ে ফেলবে ভোর ছ'টায়। কিন্তু .....

প্রিন্সেস নফিসা ইভাঝু হঠাৎ কোত্থেকে এলো? কেনই বা সে বারবার কিডন্যাপ হচ্ছে? কারা তার পিছু নিয়েছে? কেন?

তাজিকদের উচ্ছেদে সরকার ওদের সাথে গোপন আঁতাত করেছে? নানকিং সিটি মেয়রের উগ্রমূর্তির কারণ কি? দুঃসাহসী রবিন স্পাই চীফ ইকবাল শানচিকে নিয়ে ছুটছে স্কীন মুখোশধারী নকল ডাঃ পাভেল সিং-এর পিছনে। কিন্তু এই নকল লোকটি কে? প্রিন্সেস কোথায়? ছুটছে রবিন রহস্যের ধুম্রজালের পেছনে। আবার কি কোন ব্লাক হান্টার বন্ধু হবে ওদের? এসবের জবাব নিয়ে আসছে 'অপারেশন সিরিজের' প্রথম বই 'আতঙ্কিত নানকিং'।

পাঠকদের প্রতি–

✓ এখন থেকে প্রতি এক মাস অন্তর এ সিরিজের একটি করে বই বেরোবে ইনশাইল্লাহ।

✓ মুদ্রণ ব্যয় অস্বাভাবিক বৃদ্ধি না পেলে প্রতি খণ্ডের দাম থাকবে ৩০/=।

✓ আমরা চাই আপনি আপনার পাশের দোকান থেকেই প্রতিটি কপি সংগ্রহ করুন। প্রয়োজনে দোকানদারকে বই সংগ্রহে উৎসাহিত করুন।

যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে–

✓ নিজে আহবায়ক হয়ে অন্তত দশ জন সদস্য নিয়ে 'ক্রুসেড পাঠক ফোরাম' গড়ে তুলুন এবং সিরিজটিকে আরো জনপ্রিয় করতে পরামর্শ পাঠান ও পদক্ষেপ নিন।

✓ অগ্রীম টাকা পাঠানোর ভিত্তিতে পাঠক ফোরামকে ৩০% কমিশনে বই সরবরাহ করা হয়। ডাক খরচ আমাদের। পাঠক ফোরাম ছাড়াও বিভিন্ন পাঠাগার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এ সুযোগ ভোগ করতে পারেন।

✓ প্রতিটি খণ্ড বেরোনোর সাথে সাথে পাঠক ফোরামকে জানানো হয়।

বই বিক্রেতাদের প্রতি–

✓ জনপ্রিয় এ সিরিজের বই বিক্রি করে আপনিও হতে পারেন প্রচুর লাভবান। এজেন্ট ও বিক্রেতাদের সত্যিকার অর্থেই আশাতীত উচ্চ হারে কমিশন দেয়া হয়।

✓ সিরিজটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তা পাওয়ায় আমরা সারা দেশে সহজ শর্তে এজেন্ট নিয়োগ করছি। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে পাঠক ফোরামকে বই সরবরাহের দায়িত্বও এজেন্টগণ পালন করতে পারেন।

ক্রুসেড - ৭

দুর্গ পতন

গাজী সালাহউদ্দীন সেই অসামান্য সেনাপতি,
অসংখ্য কুটিল ষড়যন্ত্র, ভয়াবহ সংঘাত আর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্য
থেকে যিনি ছিনিয়ে এনেছিলেন বিজয়।
খৃস্টানরা তখন দুনিয়ার বুক থেকে ইসলামের নাম নিশানা মুছে
দিতে, তাদের সহযোগিতা করছিল ক্ষমতালোভী, বিলাসপ্রিয় মুসলিম
আমীর ওমরারা।
কৈশোরেই তিনি হাতে নিয়েছিলেন অস্ত্র, জীবন পার করেছেন এমন
সব অবিশ্বাস্য ঘটনার মধ্য দিয়ে যা কল্পনা করতেও শিউরে উঠে
মানুষ। বীরত্ব ও মহানুভবতার এমন সব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন
যার কারণে শত্রুর চোখেও হয়ে উঠেছেন 'গ্রেট সালাদীন'।
ইতিহাসে তাঁর সংঘাত, সংঘর্ষ ও বিজয়ের বিস্তর কাহিনী থাকলেও
পাশ্চাত্য লেখকরা খৃস্টানদের লেলিয়ে দেয়া সেইসব গুপ্তচররূপী
ছলনাময়ী রূপসী নারীদের কথা লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছে, যারা
বার বার আঘাত হেনেছে আয়ুবীকে।
সালাউদ্দীন আয়ুবীর সেইসব অকথিত কাহিনী এবং অবিশ্বাস্য
ঘটনাবহুল জীবনের শিহরিত ও রোমাঞ্চকর বর্ণনায় ভরপুর 'ক্রুসেড'
সিরিজের ভুবনে সবাইকে স্বাগতম।
এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলার মত বই

মূল্য : ত্রি[illegible] মাত্র